

বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বিজ্ঞান ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন
প্রফেসর ড. সফিউর রহমান
প্রফেসর এস এম হায়দার
প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহান আরা
ড. এস এম হাফিজুর রহমান
মোহাম্মাদ নূরে আলম সিদ্দিকী
ড. মোঃ আব্দুল খালেক
গুল আনার আহমেদ

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]
পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
মোঃ মোখলেসউর রহমান

কমিউটার কম্পোজ
বর্ণনস কালার স্ক্যান

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
মশিউর রহমান অনিবাগ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোত্তমুয়ী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষান্তি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপ পক্ষ-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূজনশীল প্রতিভাব বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল মুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সূজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সূজনশীল করা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। মূলত এগুলোর প্রতি লক্ষ রেখেই বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত এ শিক্ষাক্রমের আলোকেই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিকট আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছে।

একবিংশ শতকের অজ্ঞীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও মুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলগুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

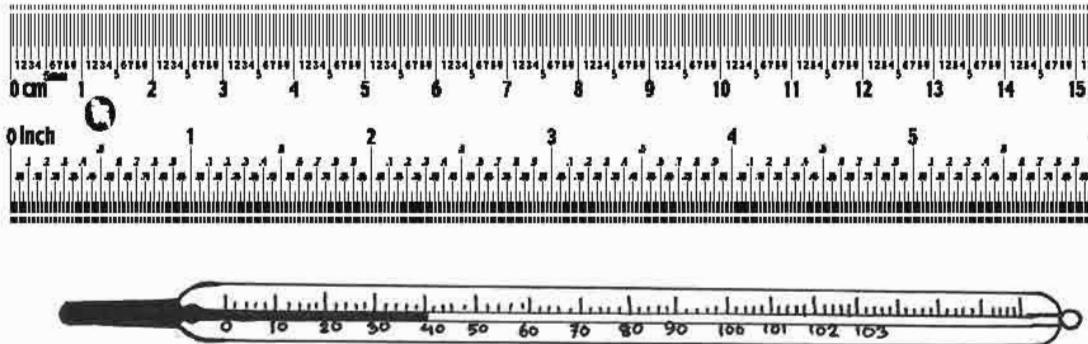
সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ	১
দ্বিতীয়	জীবজগৎ	১১
তৃতীয়	উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	২২
চতুর্থ	উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	২৯
পঞ্চম	সালোকসংশ্লেষণ	৩৯
ষষ্ঠ	সংবেদী অঙ্গ	৪৩
সপ্তম	পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব	৫১
অষ্টম	মিশ্রণ	৬১
নবম	আলোর ঘটনা	৭৪
দশম	এসো গতিকে জানি	৮৫
একাদশ	বল এবং সরল যন্ত্র	৯৬
দ্বাদশ	পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন	১০৬
ত্রয়োদশ	খাদ্য ও পুষ্টি	১১৬
চতৃদশ	পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন	১২৭

প্রথম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। এগুলো হলো- তোমার উচ্চতা কত? তোমার ওজন কত? এখন কম্বটা বাজে? আজকের তাপমাত্রা কত? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য দরকার উচ্চতা, শুভ্র, সময় বা তাপমাত্রার মাপ-জোখের। দৈনন্দিন জীবনে এই মাপ-জোখের উপর আমরা নানাভাবে নির্ভরশীল। এই মাপ-জোখের মাধ্যমে আমরা মূলত কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করে থাকি। আর এই কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাই হলো পরিমাপ। দৈনন্দিন জীবনে নালাবিধ ঘটনায় এই পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত। যেখন-বাজার থেকে চাল কিনে আনতে, রান্নার জন্য তেলের ব্যবহারের সময়, জামাকাপড় তৈরি করার সময়।



এ অধ্যায় শেষে আমরা

- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা এবং এককের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- মৌলিক ও মৌলিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব
- দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ করতে পারব
- বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ করতে পারব
- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ করতে পারব
- তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব

পাঠ ১ : বিজ্ঞান কী?

বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান। জ্ঞান কী তা জান? জ্ঞান হলো কোনো কিছু সম্পর্কে তথ্য। তাহলে বিজ্ঞান কী সম্পর্কে তথ্য? তোমরা গ্রাথমিক বিজ্ঞানে জীব, জড়, পানি, বায়ু, মাটি- এসব সম্পর্কে জেনেছ। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ। আরও জেনেছ প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা। যেমন : কীভাবে বৃষ্টি হয়? কীভাবে একটি উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে ইত্যাদি। সুতরাং বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান।

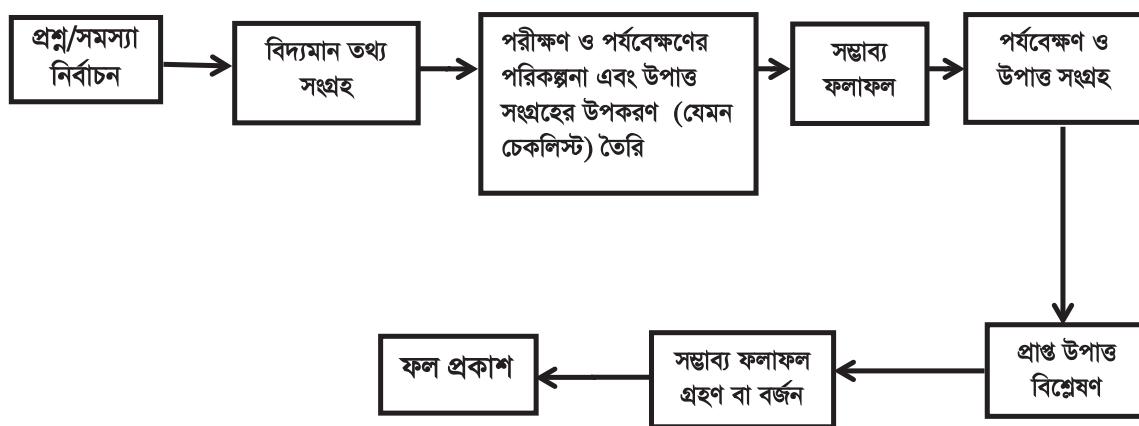
তবে প্রকৃতি সম্পর্কে যেকোনো তথ্যই বিজ্ঞান নয়। কেউ যদি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার মনগাড়ি ব্যাখ্যা দেয়, তা বিজ্ঞান হবে না। বিজ্ঞানের জ্ঞান হতে হলে তাকে হয় তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে পেতে হবে অথবা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। বৃষ্টি কীভাবে হয় তা নিয়ে হয়তো তোমরা গল্লাকারে অনেক ব্যাখ্যা শুনেছ। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান? না, এ ধরনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান নয়। কারণ, এসব ব্যাখ্যা পরীক্ষা থেকে পাওয়া নয় বা কোনো পরীক্ষা এদেরকে সমর্থন করে না।

এই জ্ঞান কীভাবে আমরা অর্জন করি? পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করি। এগুলো বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া। জ্ঞান যেমন বিজ্ঞান, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াও বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দরকার, তেমনি দরকার একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব। এগুলো হলো যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করা। অপরের মতামতের মূল্য দেওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করা। একে বিজ্ঞানমনক্ষণ বলে। বিজ্ঞানকে তাহলে কী বলা যায়? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে পাওয়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। বিজ্ঞান জ্ঞান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি তেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপ

তোমরা জানলে বিজ্ঞানের জ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের কি একটিমাত্র নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে? না একাধিক উপায়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান পাওয়া যায়? বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুসন্ধান করেছেন। তবে তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। সে মিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়।



প্রবাহ চিত্র: বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

পাঠ ২-৩ : পরীক্ষণ

পরীক্ষণ বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞান পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য প্রথমে জানা বা বিদ্যমান তথ্যের আলোকে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে এই অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে কি না তা যাচাই করেন। পরীক্ষণের উপাস্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না তাহলে তিনি নতুন করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর আবার তা পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করেন। নিচে পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপসহ একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

পরীক্ষণ : বেঁচে থাকার জন্য গাছের পানি দরকার কি না তার পরীক্ষা।

পরীক্ষণটি করতে যা যা দরকার : ছোট দুটি পাত্র, ফুলগাছের দুটি চারা, পানি, শুকনা মাটি।

১. সমস্যা নির্ধারণ : পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রথম ধাপে তোমরা সমস্যা স্থির করলে— ফুলগাছের চারা তুলে এনে লাগালে মারা যাচ্ছে কেন?

২. জানা তথ্য সংগ্রহ : তোমরা বই পড়ে, শিক্ষককে বা পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করলে কেন চারাগাছ মারা যেতে পারে। তোমরা জানলে যে পানি না পেলে চারাগাছ মারা যেতে পারে।

৩. আনুমানিক/অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ : জানা তথ্য থেকে তোমরা অনুমিত সিদ্ধান্ত নিলে— পানির অভাবে চারাগাছ মারা যায়।

৪. পরীক্ষণের পরিকল্পনা : এবার তোমরা পরীক্ষণের পরিকল্পনা করলে। একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের দুটি পাত্রে দুটি গাছ নিতে হবে। তোমরা কেবল দুটি পাত্রের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য রাখতে পারবে। অন্যসব কিছু সমান সমান রাখতে হবে। না হলে তোমরা সেটি যাচাই করতে চাও তা করতে পারবে না।

৫. পরীক্ষণ : ছোট দুটি একই রকমের পাত্র নাও। মাটি বা প্লাস্টিকের টবজাতীয় হলে ভালো হয়। পাত্র দুটির তলায় ছোট ছিদ্র কর। এবার শুকনা মাটি দিয়ে পাত্র দুটি ভরে দাও। এবার একই ধরনের দুটি চারাগাছ পাত্রে রোপণ কর। একটিতে পানি দাও আর একটি শুকনা রাখ। দুটি গাছকে ছায়ায় রেখে দাও। পরের দিন গাছ দুটিকে পর্যবেক্ষণ কর। একটি গাছ প্রায় মরে গেছে, তাই না? অন্যটি সতেজ আছে।

৬. উপাস্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ : দুটি পাত্রে একই ধরনের মাটি ছিল। চারাগাছ দুটিকে পাত্রসহ একই জায়গায় রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল পানি। একটিতে পানি দেওয়া হয়েছিল, আর একটিকে পানি দেওয়া হয়নি। এ থেকে কী সিদ্ধান্ত আসা যায়? সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে পানি না দেওয়ায় একটি চারা গাছ মারা গেছে।

৭. ফল প্রকাশ : তোমরা তোমাদের পরীক্ষণের ফল বিদ্যালয়ের বুলেটিন বোর্ডে লিখে প্রকাশ করতে পার।

এগুলো হলো পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপ। এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও ধাপ।

পাঠ ৪-৫ : পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

আমরা দৈনন্দিন জীবনে জানা-অজানা নানাবিধ ঘটনাতে অনেক সময়ই আন্দাজ করে পরিমাপ করে থাকি।

যেমন : তোমার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য কতটুকু? তুমি কখন স্কুলে রওনা দিবে? এই সকল ক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করেই পরিমাপ করার চেষ্টা কর।

বাস্তব জীবনে আবার অনেক কিছুই আছে, যেখানে আন্দাজ করে পরিমাপ করা যায় না। যেমন : স্কুলের বার্ষিক ত্রীড়া প্রতিযোগিতায় তুমি কোন গৃহপে খেলবে? টেলিভিশনে কোন সংবাদের শিরোনাম শুনতে হবে? এই সকল ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উচ্চতা বা সময়ের পরিমাপ একান্ত দরকার। আন্দাজ করে পরিমাপের ক্ষেত্রে কান্ফিত ফলাফল না-ও পেতে পার। সুতরাং, সঠিক মান বা পরিমাণ নির্ণয়ে পরিমাপ খুবই প্রয়োজনীয়।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যেকটি কাজেই সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যেমন: বাজার থেকে ঢাল, ডাল কিনতে; জামা-কাপড় তৈরি করতে কিংবা সময়মতো ক্লাস শুরু ও শেষ করতে আমাদের যথাযথ পরিমাপ দরকার। সঠিক পরিমাপ ব্যতীত একটি শ্রেণিকক্ষে কয় জোড়া টেবিল-বেঝ রাখা যাবে, বাড়ির নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কয়টা ঘর তৈরি করা যাবে, এমনকি কোন কক্ষের আকৃতি কী রকম হবে তা বলা মুশকিল হবে। এ ছাড়া তরকারি রান্নার সময় পরিমাণ মতো বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করা খুবই জরুরি। জীবন বাঁচানোর যে গুরুত্ব তাও তৈরি করতে হয় পরিমাণ মতো এবং খেতেও হয় পরিমাণ মতো। এককথায় দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।

কাজ : দৈনন্দিন জীবনের দশটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে একটি তালিকা তৈরি কর, যাতে সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন।

পরিমাপের একক

কাজ : এক খণ্ড রশি (প্রায় ২০ ফুট) নিয়ে এটিকে তোমরা প্রত্যেকে আলাদা করে নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে কি দেখতে পাবে? কার হাতে কত হাত হলো? যেহেতু তোমাদের প্রত্যেকের হাতের মাপ ভিন্ন, তাই নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে রশিটির দৈর্ঘ্য একেকজনের জন্য একেক রকম হবে। এক্ষেত্রে হয়তো দেখবে, একজন শিক্ষার্থী বলল যে রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৬ হাত এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী বলল যে রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৭ হাত।

উপরোক্ত কাজটি থেকে কী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়? কীভাবে এই বৈষম্য দূর করা যায়? মূলত এই বৈষম্য দূর করার জন্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি আদর্শের বিবেচনা আনা হয়। কোনো কিছু পরিমাপ করার জন্য একটি সুবিধাজনক পরিমাণকে আদর্শ হিসাবে ধরে নিতে হয়। কোনো একটি ন্যূনতম ক্ষুদ্র অংশকে এই আদর্শ হিসাবে ধরা হয়। এই জানা আদর্শ অংশের পরিমাপকেই পরিমাপের একক ধরা হয়।

সাধারণভাবে কোনো কিছু পরিমাপ করতে হলে, যা পরিমাপ করতে হবে তার একটি নির্দিষ্ট অংশকে এই আদর্শ হিসাবে ধরা হয়। দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য, ভর পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক ভর এবং সময় পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট সময় আদর্শ হিসাবে ধরা হয়। নিজ নিজ এই আদর্শ মানের সাথে তুলনা করেই সাধারণত বিভিন্ন জিনিসের দৈর্ঘ্য, ভর, সময় ও তাপমাত্রার পরিমাপ করা হয়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিমাপকে একটি একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ধর তুমি একটি কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপছ। দৈর্ঘ্য পরিমাপের পর তুমি বলছ ১০ মিটার। কিন্তু তুমি যদি কেবল ১০ বল তা কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ পরিমাপকে প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা ও একটি এককের প্রয়োজন।

কাজ : তোমাদের (কমপক্ষে ১০ জন) নিজ নিজ পা দিয়ে শ্রেণি কক্ষের দৈর্ঘ্য মেপে তা একটি নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ কর।

পাঠ- ৬ : মৌলিক ও যৌগিক একক

আমরা যাকে পরিমাণ করি, তাকে সাধারণত রাশি বলে থাকি। যেমন : টেবিলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করার সময় দৈর্ঘ্য হলো একটি রাশি। আবার কারো উচ্চতা পরিমাণ করার সময় উচ্চতাও একটি রাশি। এই রাশিকে পরিমাণের জন্য পরিমাপের বিভিন্ন রকমের একক আছে। এগুলোর মধ্যে কোনোটি দ্বারা কোনো কিছুকে সরাসরি পরিমাপ করা যায়। যেমন : দৈর্ঘ্যের এককের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

এখানে দৈর্ঘ্যের এককটি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই একক হলো মৌলিক একক। অনুপপত্তাবে ভরের একক, সময়ের একক, তাপমাত্রার একক, বিদ্যুৎ-প্রবাহের একক, আলোক ওজ্জ্বল্যের একক ও বস্তুর পরিমাণের একক হলো মৌলিক একক। অন্যদিকে কোনো কোনো রাশিকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কেবল একটি একক দ্বারা এর পরিমাপকে প্রকাশ করা যায় না। যেমন : একটি শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রফল পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি এককের গুণফলের ওপর নির্ভর করতে হবে। এ ছাড়া আয়তনের ক্ষেত্রে তিনটি এককের গুণফল দরকার। এই সব ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক এককের সমষ্টি দরকার। এই সমন্বিত এককই হলো যৌগিক বা লক্ষ একক। যেমন : ক্ষেত্রফলের একক হলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এককের গুণফল। অনুপপত্তাবে আয়তনের একক হলো কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার এককের গুণফল।

এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি

কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন : তোমার উচ্চতা কত? এর উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত আমরা বলি ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। আবার জাতীয় নিবন্ধন ফরম বা পাসপোর্টের ফরম পূরণের সময় আমরা লিখেছি ১ মিটার ৬১ সেন্টিমিটার। এর মানে কী হলো? আমরা একই পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি যা প্রচলিত আছে। এগুলো এমকেএস, এফপিএস ও সিজিএস পদ্ধতি নামে প্রচলিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অর্থাৎ একই রাশি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়। এককের এই বিভিন্নতার কথা বিবেচনা করে ১৯৬০ সাল থেকে পৃথিবীর সমগ্র দেশে একটি সাধারণ পরিমাপের পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটিকে এসআই বা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিট বলা হয়। এই আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে সকল ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট একক নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের একক সেকেন্ড, তাপমাত্রার একক কেলভিন, বিদ্যুৎ-প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার, আলোক ওজ্জ্বল্যের একক ক্যালেন্ডা ও পদার্থের পরিমাণের একক মোল। এগুলো মৌলিক একক।

দৈর্ঘ্যের একক

বর্তমানে দৈর্ঘ্য পরিমাপে আন্তর্জাতিক এককের ব্যবহার দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হলো মিটার। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ১৮৭৫ সালে একত্রে বসে দৈর্ঘ্যের এক মিটারের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তারা প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম নামক মিশ্রিত ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের দুই প্রান্তের দুটি দাগ দেন। শূন্য ডিপ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঐ দুটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যকার দূরত্বকে তারা এক মিটার হিসাবে নির্ধারণ করেন।

দৈর্ঘ্যের এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশ

আমরা যখন কাপড়, টেবিলের দৈর্ঘ্য কিংবা কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপি, তখন ‘মিটার’ এককটি ব্যবহার করি। কিন্তু একটি পেন্সিলের দৈর্ঘ্য মাপতে ব্যবহার করি সেন্টিমিটার (সংক্ষেপে সেমি)। আবার আমরা যখন একটি পয়সার পুরুত্ব মাপতে যাব, তখন আমরা কিন্তু এর চেয়েও ক্ষুদ্রতর একক ব্যবহার করে থাকি। এটি হলো মিলিমিটার (সংক্ষেপে মিমি)।

অন্যদিকে আমরা বেশি দূরত্ব পরিমাপ করতে (যেমন ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব) ব্যবহার করি কিলোমিটার, সংক্ষেপে কিমি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারের প্রয়োগ খুবই বেশি দেখা যায়। এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো—

১ কিলোমিটার	=	১০০০ মিটার
১ মিটার	=	১০০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার	=	১০ মিলিমিটার

পাঠ-৭ : ভরের একক

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক হলো কিলোগ্রাম। সংক্ষেপে এটি কেবল হিসাবে পরিচিত। ক্রান্তের সাথেও অবস্থিত শুজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসে সংরক্ষিত একটি দণ্ডের ভরকে একেব্যে আদর্শ হিসাবে ধরা হয়েছে। কম ভরের জন্য ব্যবহৃত একক হলো গ্রাম। এ ছাড়া বেশি ভরের বন্ধ পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কুইন্টল ও মেট্রিক টন।

$1 \text{ মেট্রিক টন} = 10 \text{ কুইন্টল}$	$1 \text{ কুইন্টল} = 100 \text{ কিলোগ্রাম}$
$1 \text{ কিলোগ্রাম} = 1000 \text{ গ্রাম}$	$1 \text{ গ্রাম} = 1000 \text{ মিলিগ্রাম}$

সময়ের একক

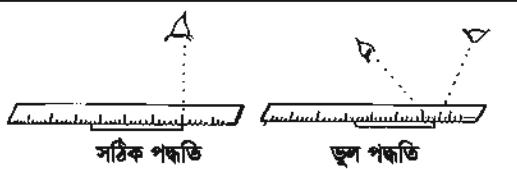
সময় পরিমাপের সকল পদ্ধতির একক হলো সেকেন্ড। তবে দৈনন্দিন জীবনে সেকেন্ডের চেয়ে এর গুণিতাংশের এককগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি। গুণিতী নিজ অক্ষের চারপাশে ঘূরে এসে একই অবস্থায় পুনরায় কিরে আসতে যে সময় লাগে, সেটি হলো ১ দিন। এক দিনের ২৪ ভাগের এক ভাগ হলো ১ ঘণ্টা। ১ ঘণ্টার ৬০ ভাগের ১ ভাগ হলো ১ মিনিট। ১ মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগই হলো আমাদের ঘৌষিক একক সেকেন্ড। সুতরাং

$1 \text{ দিন} = 24 \text{ ঘণ্টা}$
$1 \text{ ঘণ্টা} = 60 \text{ মিনিট}$
$1 \text{ মিনিট} = 60 \text{ সেকেন্ড}$

পাঠ ৮-৯ : দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের পরিমাপ

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

কাজ : প্রথমে একটি সাদা কাগজে রেখা টান। এবার একটি কলার রেখাটির উপর হাপন কর। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার চোখ সঠিক অবস্থালি থাকে। এভাবে রেখাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হবে।



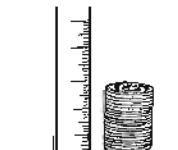
চিত্র ১.১ : দৈর্ঘ্য পরিমাপ

কাজ : কয়েকটি ৫০ পয়সার মুদ্রা একত্রে রেখে চিত্রের মতো কর এবং এর উচ্চতা নির্ণয় কর।

সর্বমোট মুদ্রা =

মোট উচ্চতা =

একটি মুদ্রার পুরুত্ব =



চিত্র ১.২ : পয়সার পুরুত্ব নির্ণয়

ভরের পরিমাপ

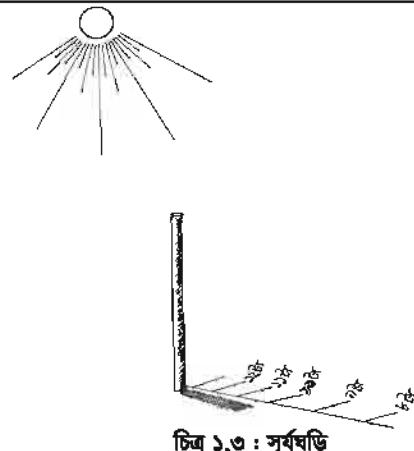
কাজ : পাত্তার বাম দিকে ১০০ গ্রামের একটি বাটখারা রাখ। এবার ডান দিকে একটির পর একটি মার্বেল দিতে থাক যতক্ষণ না বাম ও ডান দিকের পাত্তা সাম্যবস্থায় আসে।

$100 \text{ গ্রাম} = \dots \text{টি মার্বেল}$

অতএব, ১টি মার্বেলের ভর = গ্রাম = গ্রাম

সময়ের পরিমাপ

কাজ : ছবির মতো স্কুলের সামনের মাঠে রৌদ্রের যথে একটি শাঠি খাড়া করে বসিয়ে দাও। সক্ষ করলে দেখবে খাড়া কাঠিটির ছায়া পড়েছে। এই ছায়ার কিনারায় এবার একটি দাগ দাও এবং ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এবার প্রতিটি ক্লাসের পরে গিয়ে পুনরায় ছায়ার কিনারায় আবার দাগ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এভাবে প্রতি ঘট্টার পরপর দাগ দিয়ে একটি সূর্যঘড়ি তৈরি কর যা দ্বারা ছায়া দেখে সময় বলে দিতে পারবে।



চিত্র ১.৩ : সূর্যঘড়ি

পাঠ- ১০ : ক্ষেত্রফল ও তার পরিমাপ

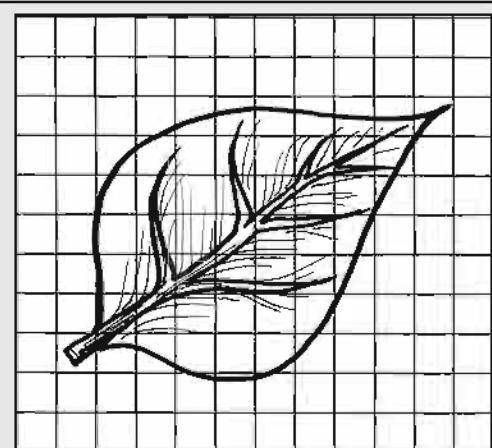
তৃমি তোমার ষষ্ঠি শ্রেণির গণিত বইটি তোমার পড়ার টেবিলে রাখ। এখন একটু দেখার চেষ্টা কর এ রকম বই আর কয়টি পড়ার টেবিলটিতে পাশাপশি রাখা যাবে। আবার এখন কি বলতে পারবে যে তোমার পড়ার টেবিলটির সমান কয়টি টেবিল তোমার পড়ার কক্ষে রাখা যাবে? কী চিন্তা করছ যে এই হিসাব তৃমি কীভাবে বের করবে? আসলে এটি বোঝার জন্য তোমাকে তোমার পড়ার টেবিলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে টেবিলের পৃষ্ঠ বা ঘরের মেঝে কভ্যুকু স্থান দখল করে আছে তা জানা যাবে। এটিকে পরিমাপ করতে হলে দৈর্ঘ্যকে অঙ্ক দিয়ে গুণ করতে হবে। অর্থাৎ

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}।$$

একটি পাতার ক্ষেত্রফল নির্ণয়

কোনো আয়তাকার বস্তুর ক্ষেত্রফল তৃমি নিচয় খুব সহজেই এখন পরিমাপ করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমাকে একটি পাতা দেয়া হয় তাহলে এ ক্ষেত্রফল তৃমি কীভাবে মাপবে? এর জন্য নিচের পরীক্ষাটি সক্ষ কর।

কাজ : প্রথমে পাতাটিকে একটি সান্দা কাগজের উপর রেখে চারপাশ দিয়ে পেলিল দিয়ে দাগাদ্বিত কর, যা পাতাটির ক্ষেত্র নির্দেশ করে। এবার পাতার ক্ষেত্রটিকে রাখাখালে রেখে তার চারপাশে একটি বর্গ অঙ্কন কর। এবার বর্গটিকে প্রথমে দৈর্ঘ্য বয়াবর ১ সে.মি পরপর এবং পরে প্রস্থ বয়াবর প্রতি ১ সে.মি পর পর রেখা টান, যাতে ১ বর্গ সে.মি এর অনেকগুলো বর্গের সৃষ্টি হয়। এবার প্রথমে কভগুলো পূর্ববর্ষ পাতার ক্ষেত্রের মধ্যে আছে তার গগনা কর। এরপর যে বর্গগুলো পুরোপুরি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেগুলো থেকে অনুমান করতে হবে। একেত্রে যে বর্গগুলো অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেগুলোকে গণনা কর। অন্যদিকে যে বর্গগুলো অর্ধেকের কম ক্ষেত্রের মধ্যে নেই, সেগুলো বাদ দিতে হবে। এভাবে পাশের চিত্রের পাতার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।



চিত্র ১.৪ : পাতার ক্ষেত্রফল নির্ণয়

পাঠ-১১ : আয়তন ও তার পরিমাপ

সাধারণভাবেই বুবা যায় যে তোমার জ্যামিতি বাক্সটি তোমার বিজ্ঞান বইয়ের তুলনায় কম জায়গা দখল করে। আবার একটি ইট যে জায়গা দখল করে দুটি ইট তার চেয়ে বেশি জায়গা দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যে জায়গা দখল করে তাকে এর আয়তন বলে। ফলে আমরা বলতে পারি, জ্যামিতি বাক্সটির আয়তন বিজ্ঞান বইয়ের চেয়ে কম কিংবা একটি ইটের আয়তন দুটি ইটের আয়তনের তুলনায় কম। আয়তন বের করতে হলে ক্ষেত্রফলকে উচ্চতা দিয়ে গুণ করতে হয়।

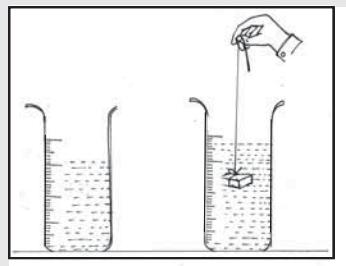
$$\text{আয়তন} = \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা}$$

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম ঘনমিটার। ১ মিটার দৈর্ঘ্য, ১ মিটার প্রস্থ ও ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঘনকেতু যে জায়গা দখল করে তা হলো ১ ঘনমিটার। ১ ঘনমিটার = ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার। সিজিএস পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার। একে সংক্ষেপে সিসি (Cubic Centimetre) বলে। তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় লিটারে। ১০০০ সিসি = এক লিটার। এক সিসিকে এক মিলিলিটারও বলা হয়। সুতরাং ১ লিটার = ১০০০ সিসি = ১০০০ মিলিলিটার।

বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ

যেকোনো সুষম বস্তু যেমন ইট বা ঘরের আয়তন সহজেই এদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে গুণ করে বের করা যায়। কিন্তু কোনো অসম বস্তুর আয়তন কীভাবে বের করব?

কাজ : এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের একটি সুষম বস্তুর আয়তন মেপে এই পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সুতা দিয়ে আয়তাকার একটি ইটের টুকরা বাঁধ। এবার মাপচোঙে কিছু পানি নিয়ে তার পাঠ নাও। এবার সুতার সাহায্যে বুলিয়ে আয়তাকার ইটের টুকরোটিকে মাপচোঙের মধ্যে ডুবাও এবং পুনরায় পাঠ নাও। দুটি পাঠের পার্থক্য থেকে আয়তাকার ইটের টুকরার আয়তন বের করা যায়। এবার মাপার ক্ষেলের সাহায্যে আয়তাকার ইটের টুকরোটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে এর আয়তন মিলিয়ে নাও। এবার অন্য দুটি অসম কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের জন্য এদের পৃথকভাবে মাপচোঙের পানির মধ্যে ডুবাও। এবার আলাদা আলাদাভাবে পাঠ দিয়ে এদের আয়তন নির্ণয় কর।

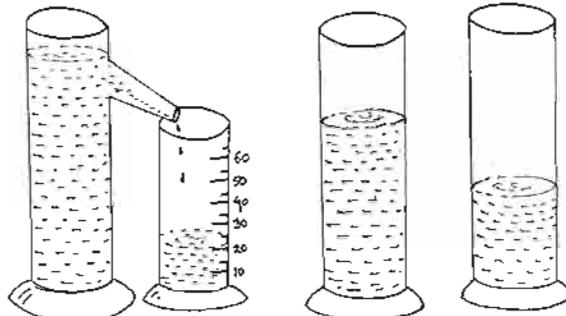


চিত্র ১.৫ : মাপচোঙ

সাবধানতা : মাপচোঙের পাঠ নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত: মাপচোঙটি একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর সোজা রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত: পাঠ নেওয়ার সময় চোখকে পানির সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে।

পাঠ-১২ : তরল পদার্থের আয়তন নির্ণয়

আমরা সাধারণত তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্য একটি দাগাক্ষিত মাপচোঙ ব্যবহার করে থাকি। নিচের দাগাক্ষিত সিলিন্ডারগুলোর ক্ষেত্রে তরলের আয়তন পরিমাপ করে খাতায় লিখ।

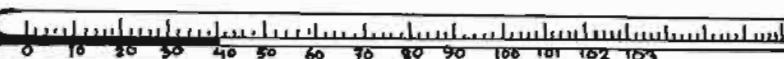


চিত্র ১.৬ তরল পদার্থের আয়তন

তাপমাত্রার পরিমাপ :

তৃষ্ণি হয়তো বিভিন্নভাবে তাপমাত্রা শব্দটির সাথে পরিচিত। যেমন : টেলিভিশন অথবা রেডিওর খবরে দিলের তাপমাত্রা বলে দেওয়া হয়। তাছাড়া কারো জুর হলে আমরা তার দেহের তাপমাত্রা মেপে জেনে নিই। তাপমাত্রা পরিমাপের আন্তর্জ্ঞাতিক একক হলো কেলভিন। তবে অখনও সারা বিশ্বে ব্যবহারিক কাজে বিশেষ করে দৈনিক তাপমাত্রা নির্ণয়ে বা জুর নির্ণয়ে সেন্টিমিটেড বা ফারেনহাইট একক দুটি বহুল ব্যবহৃত।

কাজ : প্রথমে একটি ডাঙারি থার্মোমিটার নাও। এবার এর সাহায্যে কীভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হয় তা বুঝে নাও। সাধারণত থার্মোমিটারটিতে ৯৪-১০৮ পর্যন্ত ফারেনহাইট ক্ষেত্রে দাগাক্ষিত করা থাকে। কোনো কোনো থার্মোমিটারে আবার একই সাথে ৩৫-৪২ পর্যন্ত সেলসিয়াস ক্ষেত্রে দাগাক্ষিত করা থাকে। এবার লক্ষ করে দেখবে থার্মোমিটারের ভিতরে একটি পারদ জন্ম দেখা যাচ্ছে। এটি তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে উপরে উঠতে থাকে। এবার তৃষ্ণি থার্মোমিটারটিকে হাতের নিচে বা তোমার জিহ্বার নিচে রেখে দিলে ১ মিনিট পর দেখতে পাবে পারদ জন্মের উচ্চতার কোনো পার্থক্য হয়েছে কি না? এ থেকে তৃষ্ণি তোমার গাঁওয়ের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারবে।



চিত্র ১.৭ : থার্মোমিটার

নতুন শব্দ : পরিমাপ, মৌলিক একক, যৌগিক একক, এসআই পদ্ধতি, মেট্রিক টন, কুইন্টাল

এই অধ্যাত্মে যা শিখলাম

- দৈনন্দিন জীবনে ধোয় প্রতিটি কাজেই ধ্রয়োজ্জন সঠিক পরিমাপের
- একটি জানা আদর্শ অংশের পরিমাপকে পরিমাপের একক হিসাবে ধরা হয়
- মৌলিক একক সাতটি
- যৌগিক একক

অনুশীলনী

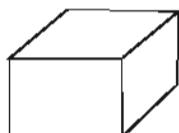
শূন্যস্থান পূরণ কর

১. পরিমাপের একক দুই প্রকার ----- ও -----।
২. আন্তর্জ্ঞাতিক পদ্ধতি এসআই এককের সংখ্যা -----টি।
৩. সকল পদ্ধতিতেই সময়ের একক -----।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ডরের একক কোনটি?
- ক. কিলোমিটার খ. কিলোগ্রাম
 গ. কেলভিন ঘ. ক্যান্ডেলা
২. একটি ইট যে জায়গা দখল করে তাকে কী বলে?
- ক. ক্ষেত্রফল খ. আয়তন
 গ. ভর ঘ. দৈর্ঘ্য

নিচের চিত্র থেকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



A

১৫ সেমি³
 ১০ সেমি³



B

পাথর কেলার পরে উচ্চতা
 পাথর কেলার আগে উচ্চতা

- ৩। **B** চিত্রে পাথরের আয়তন কত?
- ক. ৫ সে.মি³ খ. ১০ সে.মি³
 গ. ১৫ সে.মি³ ঘ. ২০ সে.মি³
৪. **A** চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুটির আয়তন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কয়টি এককের গুণফল দরকার?
- ক. একটি খ. দুইটি
 গ. তিনটি ঘ. চারটি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- প্রতিটি কাজে সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন কেন?
- মৌলিক একক কী কী?
- এককের গুণিতক বা গুণাংশের প্রয়োজন কেন হয়?
- পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ও আয়তনের মূল পার্থক্য কোথায়?

গাণিতিক সমস্যা

- একটি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৫ মিটার ও অন্ত ৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- একটি কক্ষের ক্ষেত্রফল ২০ বর্গমিটার, কক্ষটির দৈর্ঘ্য ৫ মিটার হলে এর প্রস্থ কত?
- একটি বাল্ক ২০ সে.মি. লম্বা, ১০ সে.মি. প্রস্থ এবং ৫ সে.মি. উচ্চ। ১০০ খানা বাল্কের আয়তন কত?

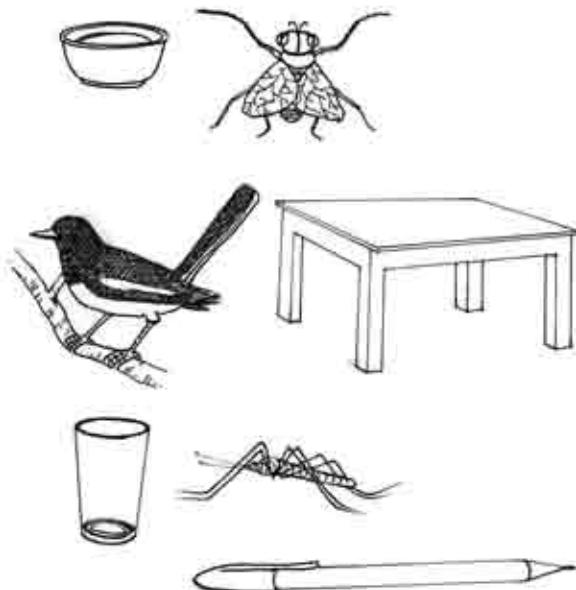
সূজনশীল প্রশ্ন :

- ফারহানের পড়ার ঘরের ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গমিটার, যার দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। তার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য ১ মিটার এবং প্রস্থ ৫০ সে.মি। ফারহানের যা সমআকৃতির আরেকটি টেবিল সেই ঘরে রাখলেন।
 ক. দৈর্ঘ্যের একক কী? খ. পরিমাপের প্রয়োজন হয় কেন?
 গ. ফারহানের পড়ার ঘরের প্রস্থ কত? ঘ. টেবিল দুটি রাখার পর ঘরে কতটুকু জায়গা ফাঁকা থাকবে?
- হোসেন উদ্দিন সরকার একজন রঞ্জনিকারক। এ বছর তিনি বিদেশে ৫ মেট্রিক টন পাট রঞ্জনি করেন।
 তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বে F. P. S পদ্ধতি ব্যবহার করলেও বর্তমানে M. K. S পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
 ক. ক্যান্ডেলা কী? খ. যৌগিক একক ব্যাখ্যা কর।
 গ. এ বছর হোসেন উদ্দিন সরকার কত কিলোগ্রাম পাট রঞ্জনি করলেন? ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি দুটির মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

विडीव अध्याय जीवजगत

आवासेव चारांसिके घडीमे विडीवे नाऱ्याहे विडिला फळ, एलेव कारो जीवन आहे आवाव कारो वा नेहि। चेताव, टेविल, हांडी-पांडी, इट, लोहा केवल फळ? आवाव आम, आम, कांठाल, खापला, इलिश, कृष्ण, गुहा, गवा, हरिप एवाई वा की?

आदेव मध्ये जीवन नेहि तांत्रा जळू। आवाव वादेव मध्ये जीवन आहे तांत्रा जीव। अकृतिके विडिला बुकमेव जीव आहे वेमल : उंडिल, मासुव, गवा, छागल, आह, पांढी इत्यादि। लाभिव सेंडला वा ब्यांडेव छाताओ जीव। एजाविवा, ब्याकटेविवा अतिकृत जीव। ए सर्वज जीव नियम जीवजगत गठित हरोहे।



ए अध्याय शेवे आमरा

- जीवेव अधान अधान बैपिट्या बाख्या कराते पाऱव।
- अधान अधान बैपिट्येर आलोके जीवजगतेव श्रेष्ठिकरण कराते पाऱव।
- संपूर्णक व असंपूर्णक उडिसेव बैपिट्या बाख्या कराते पाऱव।
- मेलूदंडी एवं अमेलूदंडी आणीर मध्ये पार्श्वक्य कराते पाऱव।
- चारपालेव जीवजगत सम्पार्के साचेतन ह्य एवं आनवजीवमे एसव जीवेव उन्हातु उगलाकी कराते सक्कम ह्य।
- विद्यालयेव चारपालेव गरिवोणे अवशित जीवेव श्रेष्ठिविनायास करू शोस्टावे अदर्शन कराते पाऱव।

পাঠ-১ : জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য

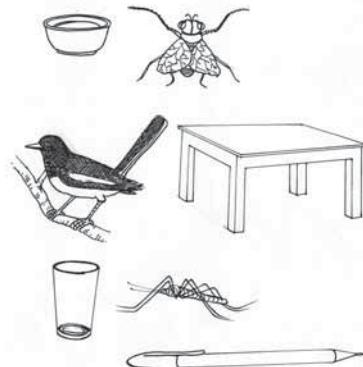
আমরা এ পাঠে জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি যার জীবন আছে তারাই জীব। গাছপালা, গরু, ছাগল, মাছ, পোকামাকড়, ব্যাঙের ছাতা, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি সবই জীব। ইট, পাথর, পানি, বায়ু, থালাবাটি ইত্যাদি বস্তুর জীবন নেই, তাই তারা জড়।

জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য

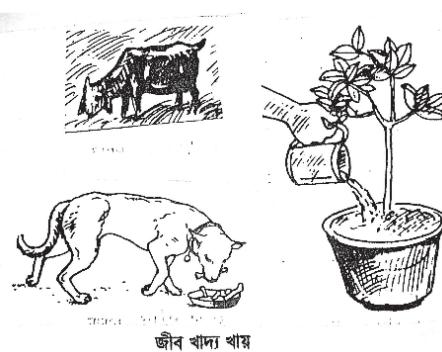
১। চলন : জীব নিজের ইচ্ছায় নড়াচড়া করতে পারে। কোনো কোনো জীব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেও পারে। উঙ্গিদ বেড়ে উঠার সময় তার ডগা নড়াচড়া করে। কিন্তু একটি জড় কি তা পারে?

২। পুষ্টি : প্রতিটি জীবই খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। এক খন্দ পাথর কি খাদ্য গ্রহণ করতে পারে?

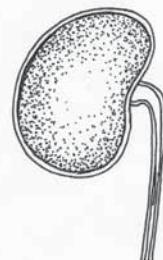
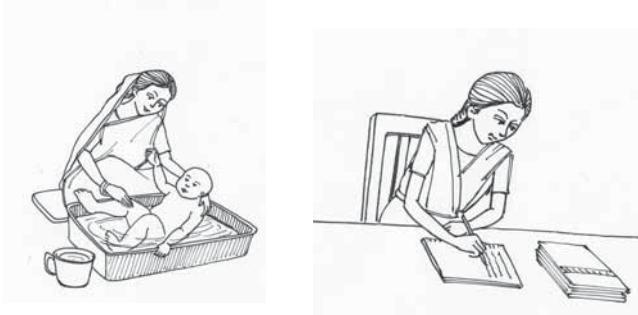
৩। প্রজনন : প্রতিটি জীবই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। প্রাণীর বাচ্চা হয়, উঙ্গিদের চারা হয়। একটি জড় কি তা পারে?



চিত্র-২.১ : কতিপয় জীব ও জড়



চিত্র-২.২: জীবের খাদ্য খায়



চিত্র ২.৩ : জীবের বৃদ্ধি, শ্বাস গ্রহণ ও রেচন

৪। রেচন : প্রতিটি জীব বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার দেহে উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দেয়। এ প্রক্রিয়াই রেচন। মূত্র ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ একধরনের রেচন প্রক্রিয়া। একটি জড়তে কি এ ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায়?
৫। অনুভূতি : আমাদের শরীরে সুঁচ ফুটালে আমরা ব্যাখ্যা পাই, আবার চোখে তীব্র আলো পড়লে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সুঁচ বা আলো আমাদের দেহে অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। একটি লজ্জাবতী গাছের পাতা ছুলেই তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একটি ইট বা পাথরকে ছুলে বা সুঁচ ফুটালে সে কি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে?

কাজ : দলগত কাজ

একটি উদ্ভিদকে লক্ষ কর। এর মধ্যে জীবের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে তা পোস্টার কাগজে লিখ এবং বোর্ডে প্রদর্শন কর।

৬। **শ্বাস-প্রশ্বাস :** প্রতিটি জীব জন্মের পর থেকে শ্বাস প্রহণ ও ত্যাগ করা শুরু করে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যহত থাকবে।

৭। **বৃদ্ধি :** প্রতিটি জীব জন্মের পর থেকেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু একটি জড় পদার্থে সেরূপ কিছু হয় কি?

৮। **অভিযোজন :** পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে পারাই অভিযোজন। একটি জীব পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়।

কাজ : দলগত কাজ

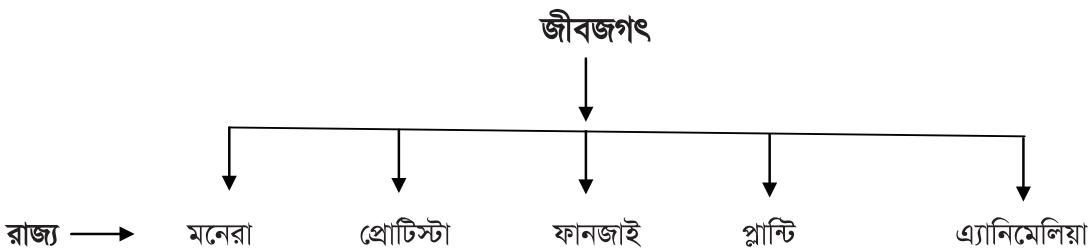
গরু, ছাগল, মাছ, পোকামাকড়, ব্যাঙের ছাতা, ব্যাকচেরিয়া, পিংপড়া আম, জাম, কাঁঠাল, সরিষা, মরিচ, গাছের চারা, ইট, পাথর, পানি, থালাবাটি ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনো। এবার এদের জড়, প্রাণী ও উদ্ভিদ- এই তিনি শ্রেণিতে ভাগ করে তালিকা টানিয়ে দাও।

নতুন শব্দ : প্রজনন, পুষ্টি, রেচন, অভিযোজন, অনুভূতি, বৃদ্ধি, নড়াচড়া।

পাঠ- ২ : জীবজগতের শ্রেণিকরণ

কম সময়ে সহজে জীবজগৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য বর্তমান ও অতীতের সব জীবকে একটি পদ্ধতিতে সাজানো হয়। একেই শ্রেণিকরণ বলা হয়।

জীব বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময় জীবকে শ্রেণিবদ্ধকরণের চেষ্টা করেছেন। সর্বাধুনিক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন ১৯৭৮ সালে বিজ্ঞানী মারগিউলিস (Margulis) ও হ্রাইটেকার (Whittaker)। আধুনিক শ্রেণিকরণ পদ্ধতিতে জীবজগৎকে মোট ৫টি রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে।



এবার দেখা যাক জীবগুলোকে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা আলাদা জীবরাজ্যের অধীনে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

রাজ্য-১ : মনেরা : এ রাজ্যের অধীনে বিন্যস্ত জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : ক) জীবটি এক কোষী এবং এর কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না খ) এরা খুবই ক্ষুদ্র এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। উদাহরণ : রাইজোবিয়াম।

রাজ্য-২ : প্রোটিস্টা : এর অধীনে এই সকল জীবকে বিন্যস্ত করা হয়, যাদের কোষ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত। এরা এককোষী বা দলবদ্ধভাবে থাকতে পারে। উদাহরণ : ইউগ্নেনা, অ্যামিবা।

রাজ্য- ৩ ফানজাই বা ছত্রাক : এদের দেহে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এরা সাধারণত এককোষী বা বহুকোষী হয়। দেহে ক্লোরোফিল নেই, তাই এরা পরভোজী। উদাহরণ- ইস্ট, পেনিসিলিয়াম, মাশরূম ইত্যাদি।

রাজ্য- ৪ : প্লাটি (উক্তি অঙ্গৎ) : এরা সাধারণত নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে তাই এরা স্বত্ত্বাজী। এরা এক বা বহুকোষী হতে পারে। কোষথাটীর সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত। এদের কোষ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত। উদাহরণ- ফার্ন, আম, জ্বাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

রাজ্য-৫- এ্যানিমেলিয়া (প্রাণিজগৎ) : এসব জীবের কোষে সেলুলোজ নির্মিত কোষথাটীর থাকে না। সাধারণত এ কোষগুলোতে প্লাস্টিডও থাকে না। তাই খাদ্যের জন্য এরা উক্তিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ- মাছ, পাখি, গরু, মানুষ ইত্যাদি।

কাজ : পোস্টার কাগজে জীবজগতের ছকটি লিখ এবং এর প্রত্যেকটির ২টি করে শবাঙ্গকারী বৈশিষ্ট্য পোস্টার কাগজে লিখে প্রদর্শন কর। জীবজগতের প্রত্যিটি রাজ্য থেকে উদাহরণসহ একটি করে বৈশিষ্ট্য পোস্টার কাগজে লিখে বোর্ডে টানিয়ে দাও। ৫টি দলে ভাগ করে কাজটি করবে।

নতুন শব্দ : মনেরা, প্রোটিস্টা, প্লাটি, এ্যানিমেলিয়া, ফানজাই।

পাঠ ৩ : অপুষ্পক উক্তিদের প্রেরিকরণ

উক্তিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উক্তিদে ফুল ও ফল হয় না। এরা স্পোর বা রেণু সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে। এদের অপুষ্পক উক্তিদ বলে। অপুষ্পক উক্তিদগুলোকে প্রথমত ৪ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ক) আদি উক্তি, খ) সমাঙ্গ উক্তি, গ) মস ও ঘ) কার্ন।

ক) আদি উক্তি : এসব উক্তি ধালি চোখে দেখা যায় না। এদের কোনো কোনো সদস্য এতই স্থুত্র যে এদের দেখতে অশুরীক্ষণ ঘরের প্রয়োজন হয়। এদের বর্ণ সবুজ নয় এবং এরা পরতোজী। ব্যাকটেরিয়া এ দলের সদস্য। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বহু সদস্যই রোগ সৃষ্টি করে।

খ) সমাঙ্গ উক্তি : যে সকল উক্তিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না, তাদের সমাঙ্গ উক্তি বর্গের উক্তিদ বলে। সমাঙ্গ উক্তি দুই প্রকার যথা- শৈবাল ও ছত্রাক।



চিত্র : ২.৪ ক শৈবাল খ ছত্রাক

ছত্রাক : সমাঙ্গদেহী উক্তিদের মধ্যে কিছু উক্তি রয়েছে, যাদের দেহ সবুজ নয়। কারণ এদের ক্লোরোফিল থাকে না। এ জন্য এরা পরতোজী। এরা সাধারণত ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মে। যেমন- মালুম, পেনিসেলিয়াম ইত্যাদি।

কাজ :

শ্বেতলা, ব্যাক্টের ছাতা, সরিবা, তেলাপোকা, কেঁচো ইত্যাদির মধ্যে কোনটি অপুষ্পক উক্তি। বৈশিষ্ট্যসহ পোস্টার কাগজে প্রদর্শন কর।

সতৃপ শব্দ : সমাজদের কাঙ ও পাতা বরেছে। তবে সাধারণত উচ্চিসের ন্যায় মূল নেই। তবে মূলের পরিবর্তে বাইজন্টেন বরেছে। এরা সতৃপ ও খড়োজী। এদের স্ট্যাভসেটে ইট, মাটি, দেয়াল ও গাছের বাকলে জন্মাতে দেখা যায়। এ হংসা পানিতে জাস্যান অবস্থায়ও এদের দেখা যায়। সাধারণত এরা পুরাতন জেজা দেয়ালে কার্পেটের হকে নরম আভয়ে করে ঠাসা ঠাসিয়াবে জন্মে। বেমন : মস।

কার্ম : কার্ম অপুন্তক উচ্চিসের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চিস। কার্মের দেহ মূল, কাঙ ও পাতায় বিচক্ষ। বাটির পাশে স্ট্যাভসেটে ছায়াযুক্ত হালে ঘৰৎ পুরানো দালানের ধাচীরে এরা আছু পরিষ্কারে জন্মে। বেমন : টেকিশাক।



চিত্র-২.৫ : মূল ও কার্ম।

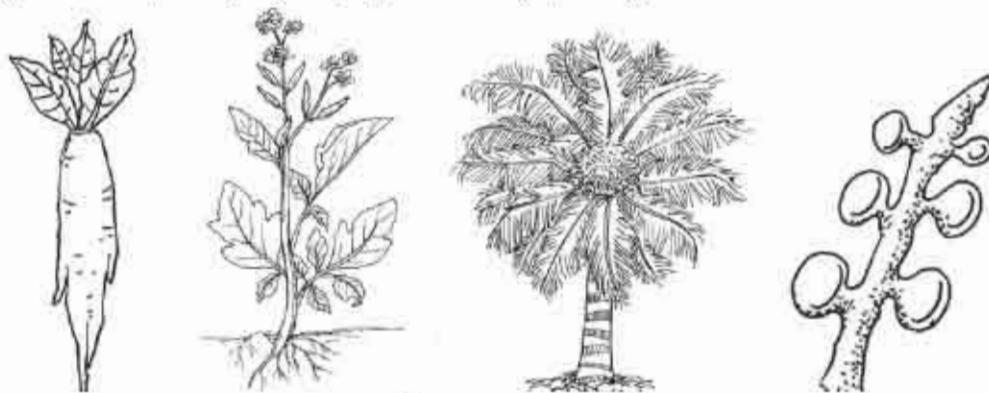
কাঙ : টেকিশাক, সালশাক, সাইশাক, পম, সরিবাগাহ, ব্যাকের হাতা ইত্যাদি সমষ্টি করে আসা এবং কোম্পটি কার্ম মন তা ধাকার লিখ।

সতৃপ শব্দ : মস, কার্ম, টেকিশাক

পাঠ- ৪- ৬ : সপুন্তক উচ্চিস

বে সকল উচ্চিসে ফুল উৎপন্ন হয়, তাদের সপুন্তক উচ্চিস বলে। বেমন : আগ, কাঠাল, শাপলা, জবা ইত্যাদি। এদের দেহ সুস্পষ্টভাবে মূল, কাঙ ও পাতার বিচক্ষ। কোনো উচ্চিস ফুল উৎপন্ন করে আবার কেউ কুল উৎপন্ন করে না, তাই বীজকলো অন্যান্য তাকে। এরা প্রধানত মুই খরনের ফুল : নগুবীজী উচ্চিস ও আবৃতবীজী উচ্চিস। এদের দেহে অত্যন্ত উচ্চিস ধরনের পরিবহন করা উপযুক্ত থাকে। এরাই কাঠ প্রসানকীয়ী উচ্চিস।

১। **নগুবীজী উচ্চিস :** এসব উচ্চিসের ফুলে ডিম্বাশয় না ধাকার ডিম্বকলো নগ্ন থাকে। এসব ডিম্বক পরিষ্কার হলে বীজ উৎপন্ন করে। উদাহরণ- সাইকাস, পাইলাস, অরোকেরিয়া (ক্রিপ্সাস টি)

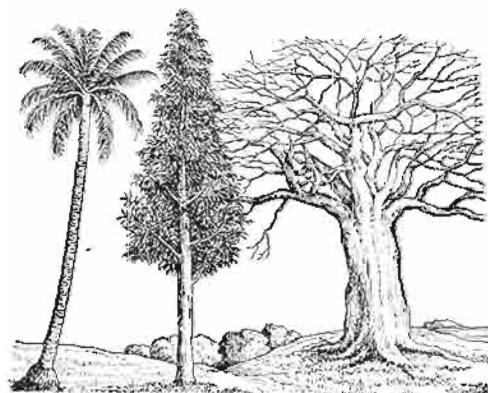


চিত্র ২.৬ : সপুন্তক উচ্চিস

কাঙ : নগুবীজী ও আবৃতবীজী উচ্চিসের বৈশিষ্ট্য লোকটির কাণের লিখে বোর্ডে চুলিয়ে দাও।

পাঠ- ৭ : সপুষ্পক আবৃতবীজী উদ্ভিদ

আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, সুগারিসহ আমাদের চারপাশে অধিকাংশ সবুজ উদ্ভিদই সপুষ্পক আবৃতবীজী উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদের ফুলে ডিম্বাশয় থাকে। ডিম্বকঙ্গলো ডিম্বাশয়ের ভিতরে সজ্জিত থাকে। নিষেকের পর ডিম্বক বীজে ও ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। এ কারণে বীজগুলো ফলের ভিতরে আবৃত অবস্থায় থাকে।



চিত্র- ২.৭ : কতিপয় সপুষ্পক আবৃতবীজী উদ্ভিদ।

কাজ : শিক্ষকের সহায়তায় নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ বাংলাদেশের কোন কোন জেলার পাওয়া যায় তার একটি চার্ট তৈরি কর।

পাঠ - ৮ : অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

একটি আস্ত বা গোটা রান্না করা মাছ নাও। আস্তে আস্তে মাছের নরম অংশগুলো সরিয়ে নাও। যেন মাছের লম্বা কাঁটাটা দেখে না যায়। এবার পড়ে থাকা কাঁটাটা লক্ষ কর। মাছের ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত যে শক্ত দণ্ডের মতো লম্বা কাঁটাটি দেখতে পাচ্ছ, সেটিই মেরুদণ্ড। এবার তোমরা সবাই তোমাদের পিঠের মাঝ বরাবর হাত দাও। ঘাড় থেকে শুরু করে কোমরের শেষ পর্যন্ত পিঠের মাঝখান বরাবর শক্ত লম্বা হাড়ের দণ্ড অনুভব করছ কি? এটিই মেরুদণ্ড।

মেরুদণ্ডের উপরিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিগুলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী। মাছ, ব্যাঙ, পাখি, টিকটিকি, গরু, ছাগল, মানুষ ইত্যাদির মেরুদণ্ড আছে। মেরুদণ্ড আছে বলে এরা মেরুদণ্ডী প্রাণি। মশা, মাছি, প্রজাপতি, চিংড়ি, কাঁকড়া, কেঁচো এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অর্থাৎ এদের মেরুদণ্ড নেই। নিচের কোন কোন প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে এবং কোন কোন প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই তা তোমার খাতায় লিখ।

তেলাপোকা, মাছ, মুরগি, কুকুর, ব্যাঙ, টিকটিকি, কেঁচো, মশা, গরু, প্রজাপতি, শামুক, তারামাছ। এসো এবার আমাদের বাড়ি ও বিদ্যালয়ের চারপাশের কিছু প্রাণীদের সাথে পরিচিত হই।

কাজ : ক্লাসের ৪/৫ জন করে চারটি দল বিদ্যালয়ের চারদিকের দেখা প্রাণীগুলোর নাম খাতায় লিখে আনবে। অতঃপর প্রতিটি দল তাদের দেখা প্রাণীগুলোকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণিতে শ্রেণিকরণ করে কাসে উপস্থাপন করবে। এক দল উপস্থাপনের সময় অন্যরা প্রশ্ন থাকলে তা করবে।

পাঠ- ৯-১০ : অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি কেমন করে নানা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উষ্ণিদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণিগত্যকেও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মাত্র দুইটি দলে ভাগ করা যায় যেমন- অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো :
অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই, এদের দেহের ভিতর কক্ষাল থাকে না, চোখ সরল প্রকৃতির বা একটি চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে যাকে পুঁজ্বাক্ষি বলে। এদের লেজ নেই।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী নানা ধরনের হয়। অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী আকারে খুবই ছোট, এদের খালি চোখে দেখা যায় না। যামিবা এমন একটি প্রাণী। কেঁচো, জঁক একদলভূক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী, এদের দেহ অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত থাকে। শামুক ও ঝিনুক আরেক দলভূক্ত প্রাণী, এদের দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয় এবং দেহ সাধারণ শক্ত খোলসে আবৃত থাকে। মাংসল পা থাকে। প্রজাপতি, মশা, মাছি, তেলাপোকা, উইপোকা, মৌমাছি ইত্যাদি পতঙ্গ দলভূক্ত প্রাণী। পৃথিবীতে পতঙ্গ শ্রেণিভূক্ত প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এদের দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত যথা : মস্তক, বক্ষ ও উদর। এদের সম্মিলিত পা ও পুঁজ্বাক্ষি থাকে। অনেক পতঙ্গ আমাদের উপকার করে। এরা উপকারী পতঙ্গ। যেমন : মৌমাছি, রেশম পোকা। মশা ও মাছি নানা রকম রোগ ছড়ায়। আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও ফসলের ক্ষতিসাধন করে। যেমন : উইপোকা, লেদাপোকা, পামরীপোকা ইত্যাদি। এমন কতকগুলো সামুদ্রিক প্রাণী আছে, যাদের ডুকে কাঁটার ঘতো অংশ থাকে। তারা মাছ ও সামুদ্রিক শশা এই দলভূক্ত প্রাণী। জেলী মাছ, প্রবালকীট আরেক দলভূক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের দেহের ভিতর একটা ফাঁপা গহর থাকে একে সিলেটেরন বলে। এদের দেহে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে এরা খাদ্য গ্রহণ করে আবার বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়।

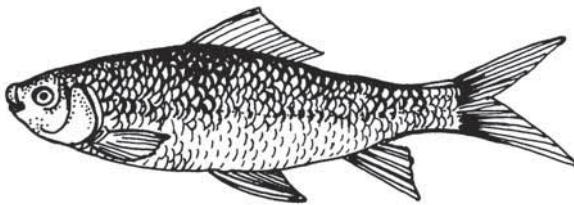
অমেরুদণ্ডী প্রাণীর যেমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি মেরুদণ্ডী প্রাণীরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

এদের মেরুদণ্ড আছে। দেহের ভিতর কক্ষাল থাকে। পাখনা বা দুই জোড়া পা থাকে। চোখ সরল প্রকৃতির। মানুষ ছাড়া সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর লেজ থাকে। এরা ফুলকা বা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।



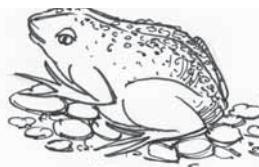
চিত্র ২.৮ : কতকগুলো অমেরুদণ্ডী প্রাণী

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈচিত্রের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সকল মাছ মৎস শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এরা পানিতে বাস করে, এদের বেশির ভাগ মাছের গায়ে অঁইশ থাকে। যেমন- ইলিশ, রংই, কৈ ইত্যাদি। আবার কতকগুলোর অঁইশ থাকে না। যেমন- মাগুর, শং, টেংরা, বোয়াল ইত্যাদি। ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের পাখনা আছে, পাখনার সাহায্যে এরা সাঁতার কাঁটে।



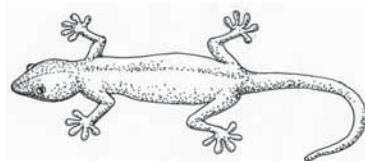
চিত্র ২.৯ : রংই মাছ

ব্যাঙ উভচর শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এদের জীবনের কিছু সময় ডাঙায় ও কিছু সময় পানিতে বাস করে। এদের ত্বকে লোম, অঁইশ বা পালক কিছুই থাকে না। দুই জোড়া পা থাকে, পায়ের আঙুলে কোনো নখ থাকে না। ব্যাঙাচি অবস্থায় এরা ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।



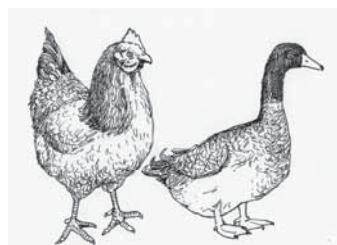
চিত্র ২.১০ ব্যাঙ

টিকটিকি, কুমির, সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি সরীসৃপ শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এরা বুকে ভর দিয়ে চলে, আঙুলে নখ থাকে, ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।



চিত্র ২.১১ : টিকটিকি

হঁস, মুরগি, কবুতর, দোয়েল ইত্যাদিসহ সব পাখি পক্ষী শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এদের দেহ পালক দিয়ে আবৃত থাকে। পালক পাখি চেনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাখি ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পালক নেই। বেশিরভাগ পাখই আছে যারা উড়তে পারে। উট পাখি, পেঙ্গুইন এবং আরও কিছু পাখি আছে যারা উড়তে পারে না। পাখি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়।



চিত্র ২.১২ : হঁস ও মুরগি

বানর, ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ইত্যাদি স্তন্যপায়ী শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। মানুষও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের দেহে লোম থাকে, বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়, মায়েরা বাচ্চা প্রসব করে। স্তন্যপায়ী প্রাণী মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখি থেকে বুদ্ধিমান। এদের মস্তিষ্ক ও দেহের গঠন বেশ উন্নত।

নিচের ছকটি তোমার বিজ্ঞানের খাতায় এঁকে নিয়ে পূরণ কর। প্রতিটি প্রাণীর নিচে তিনটি বৈশিষ্ট্য যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দাও। যেমন : রংই মাছে, অঁইশ আছে। তাই রংই মাছের কলামে অঁইশ জায়গায় টিক (✓) চিহ্ন দাও।



চিত্র ২.১৩ : মানুষ ও ইঁদুর

	কাক	রুই মাছ	টিকটিকি	সোনা ব্যাঙ	ইলিশ মাছ	কুকুর	মুরগি	সাপ	ছাগল	কুনো ব্যাঙ
<u>দেহ-আবরক</u> লোম আছে পালক আছে অঁইশ আছে										
<u>উপাঙ্গসমূহ</u> ডানা আছে পা আছে পাখনা আছে কিছুই নেই										
<u>মুখ-গহ্বর</u> সহজে দাঁত দেখা যায় দাঁত ছেট চোখ আছে										

নতুন শব্দ : পরভোজী, পরজীবী, মৃতজীবী।

এ অধ্যায়ে কী শিখলাম

- জীব নড়াচড়া করে, পুষ্টি, প্রজনন, শ্বসন, অনুভূতি, অভিযোগন, বৃদ্ধি ও রেচন হয়।
- জীবজগতের পাঁচটি রাজ্য, যথা- মনেরা, প্রোটিস্টা, উক্তিদ, ছত্রাক ও প্রাণী।
- অপুষ্পক উক্তিদ চার ধরনের, যথা - আদি উক্তিদ, সমাজ উক্তিদ, মস ও ফার্ন।
- সপুষ্পক উক্তিদ দু'ধরনের, যথা- নগুবীজী ও আবৃতবীজী।
- আবৃতবীজী উক্তিদ দু'ধরনের, যথা- একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ :

- শামুকের দেহে ----- ও ----- থাকে।
- স্তন্যপায়ী প্রাণীর ----- বেশ উন্নত।
- উক্তিদে সবুজ কণিকা থাকে, তাই তারা -----।
- ছত্রাক অসবুজ তাই তারা নিজের -----তৈরি করতে পারে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ইউগ্নেনা কোন রাজ্যের অঙ্গরূপ?

ক. মনেরা

খ. প্রোটিস্টা

গ. প্লান্ট

ঘ. ফানজাই

২. পরভোজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা -
- সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে
 - জীবিত জীব থেকে খাদ্য শোষণ করে
 - মৃত জীবের দেহাবশেষ গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাফিস হ্রামে গিয়ে দেখল তার চাচা সন্ধিযুক্ত পা ও পুঞ্জাক্ষিবিশিষ্ট এক ধরনের প্রাণী খুব যত্নের সাথে পালন করছে, যা উড়ে বেড়ায় ও ডিম পাড়ে। একটি গাছের ডালে সে অন্য একটি প্রাণী দেখল যা উড়ে বেড়ালেও ডিম পাড়ে না এবং মাত্তদুংশ পান করে।

৩. নাফিসের চাচা কোন প্রাণীটি পালন করছে?

- | | |
|---------------|------------|
| ক. পামরী পোকা | খ. উই পোকা |
| গ. প্রজাপতি | ঘ. মৌমাছি |

৪. গাছের ডালের প্রাণীটি -

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| i. আঙুলে নখযুক্ত | ii. গায়ে লোমযুক্ত |
| iii. বাচ্চা প্রসব করে | |

নিচের কোনটি সঠিক?

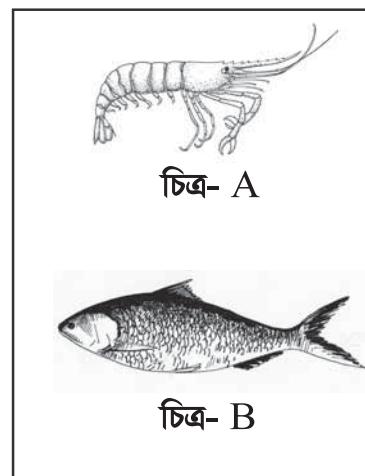
- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও i | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- একটি ব্যাঙ, একটি ছেট চারাগাছ ও একটি চশমা যদি একটি কাচের জার দিয়ে ১৫ দিন দেকে রাখা যায় তা হলে এর ফলাফল কী হবে খাতায় লেখ।
- উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- শৈবাল, মস ও ফানের পার্থক্যগুলো কী কী?
- মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্যগুলো লিখ।
- নগুবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

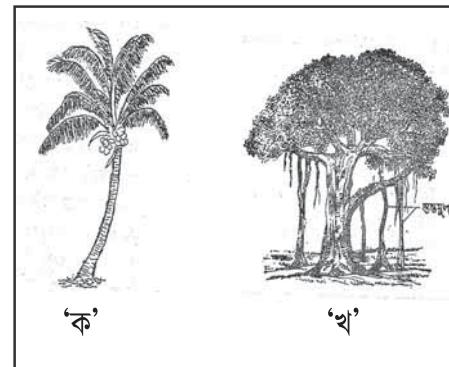
সূজনশীল প্রশ্ন :

- ক. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?
খ. A প্রাণিটির ২টি বৈশিষ্ট্য লিখ?
গ. A ও B এর পার্থক্য লিখ?
ঘ. আমাদের জীবনে প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।



২। ক. সপুষ্পক উদ্ভিদ কাকে বলে?

- খ. 'ক' চিরের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর?
- গ. 'ক' ও 'খ' এর পার্থক্য লিখ।
- ঘ. আমাদের জীবনে 'ক' উদ্ভিদের গুরুত্ব আলোচনা কর।



নিজেরা কর :

১. বাঘ, ছাগল, গরু, সাপ, ইলিশ, হাতি, তিমি, টিকটিকি, ব্যাঙ, গোসাপ, কুমির, ঝুপচাদা, উট, কাক, কোকিল, শালিক, বানর, টিয়া, টেগল, চিল, কই, শিং, রংই, হরিণ, শেয়াল।

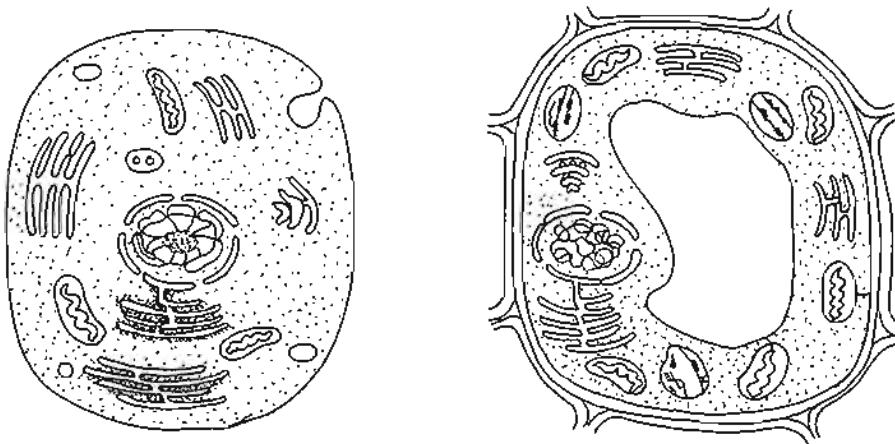
উপরের তালিকাটি দেখে নিচের ছকটি পূরণ কর :

প্রাণীর নাম	মৎস্য	উভচর	সরীসৃপ	পাখি	স্তন্যপায়ী

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

জীবদেহ কঙগলো স্থুত স্থুত বঙ্গের ন্যায় বস্তু দিয়ে গঠিত। এরা একটির উপর একটি সঙ্গিত হয়ে জীবদেহ গঠন করে। একটি জীব দেহের প্রত্যেকটি বজ্রই প্রায় একই ধরনের। তাই এদেরকে গঠন ও কাজের একক বলা হয়। এরাই কোষ নামে পরিচিত। তোমরা নিশ্চয় ইট দিয়ে দেয়াল বানাতে দেখেছ। একটির উপরে একটি ইট সঙ্গিয়ে যেমন দেয়াল নির্মাণ করা হয়, তেমনি একটির উপর একটি কোষ সঙ্গিয়ে একটি জীবদেহ গঠিত হয়।



এ অধ্যায় শেষে আমরা

- ১। কোষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ২। উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের পার্থক্যকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ৩। জীবদেহে কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ৪। জীবদেহের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান উপসঞ্চি করতে পারব।
- ৫। উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের প্রধান পার্থক্যকারী অঙ্গালুসমূহের চিহ্ন অঙ্কন করতে পারব।

পার্ট ১-২ : কোষ

কোষ জীবের গঠন একক। একক কাকে বলে তা তোমরা জেনেছ। জীবদেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বলে। কোটি কোটি কোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত। তোমরা রাজমিহিরের ইট দিয়ে দেয়াল বানাতে দেখেছ। একটি দেয়াল বানাতে কতগুলো ইট লাগে? তোমরা বলবে অনেক অনেক ইট লাগে। ঠিকই বলেছ অসংখ্য ইট সুড়ে দিয়ে একটি দেয়াল তৈরি হয়। এভাবে ধীরে ধীরে একটি মন্ত পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। বাড়িটি তৈরির কাজ শেষ হলে প্রতিটি ইটকে আলাদা করে দেখা যায় না। গাঁথার আগে সবাই বলতো ইট আর এখন বলছে একটি পাকা বাড়ি। তাই তো? তোমার, আমার সবার শরীরই একপ কতগুলো সুন্দর ইটের আকারের বক্স দিয়ে তৈরি। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। এসব বক্সগুলোকে এখন আমরা কোষ বলে জানি। অ্যামিবা বা ফ্রোরেলা মাত্র একটি কোষ দ্বারা গঠিত জীব। কোষ কে প্রথম আবিষ্কার করেন তা কি তোমরা জান? ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হক ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বোতলের ছিপি পরীক্ষা করে মৌচাকের ন্যায় কতগুলো বক্স পরপর সাজানো দেখতে পান। এ গুলোকে তিনি কোষ নাম দেন। এগুলো ছিল মৃত কোষ। জীবস্ত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে। প্রকৃত পক্ষে তিনি কোষের চারিদিকের দেয়ালগুলোই শুধু দেখতে পেয়েছিলেন।

কাজ : শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

জীব কোষের প্রকারভেদ

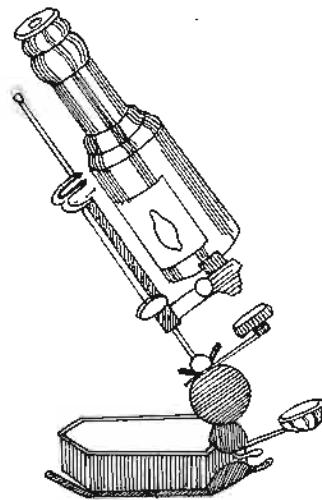
কেন্দ্রিকার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে কোষকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ। আদি কোষের নিউক্লিয়াস কোনো আবরণী দ্বারা আবক্ষ নয়। যেমন- ব্যাকটেরিয়া। প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসে আবরণ থাকে। প্রকৃত কোষকে তাদের কাজের ভিত্তিতে দুইভাগে ভাগ কর হয়, যথা- দেহকোষ ও জননকোষ। দেহকোষ দেহের গঠন ও বৃক্ষিতে অংশগ্রহণ করে। এসব কোষ বিভাজনের কারণে জীবদেহ বৃদ্ধি পায়। জননকোষের কাজ হলো জীবের প্রজননে অংশ নেওয়া।

জীবের দেহে বিভিন্ন আকার আকৃতির কোষ দেখা যায়, যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার, আয়তাকার ইত্যাদি। সাধারণত কোষ এতই সুন্দর যে খালি চোখে দেখা যায় না।

নতুন শব্দ : প্রোটোপ্লাজম, দেহকোষ, জননকোষ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পার্ট ৩ - ৬ : একটি জীব কোষের গঠন

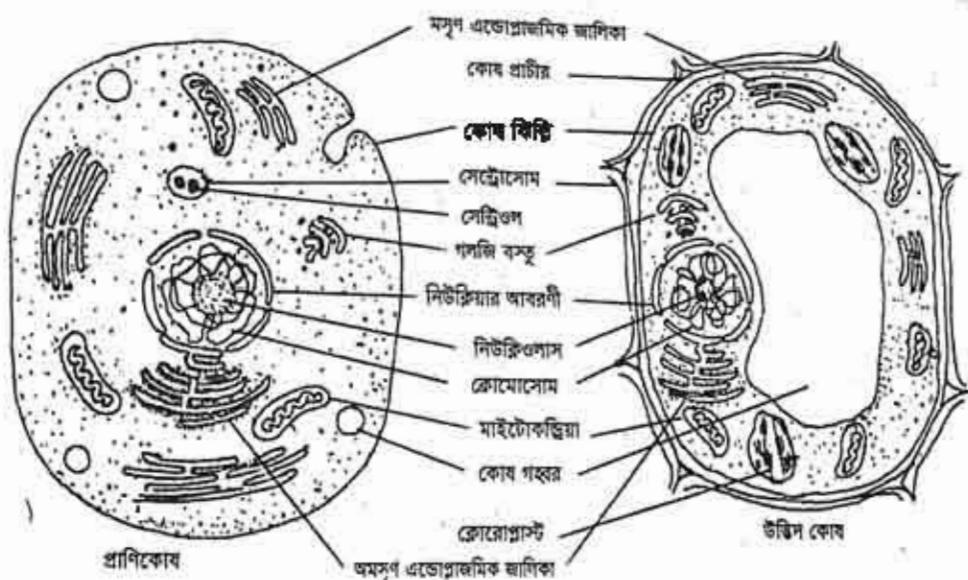
একটি জীব কোষ এতই ছোট যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। তাই বলে মানুষ কিন্তু বসে নেই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কোষ বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। বর্তমানে ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোষের সূক্ষ্ম অংশগুলোও ভালো দেখা যাচ্ছে। এর ফলে কোষে অনেকগুলো সুন্দর আবিষ্কৃত হয়েছে। এবার কোষের প্রধান প্রধান অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।



চিত্র ৩.১ : রবার্টহকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

ক) কোষথাটির : অধু উদ্ভিদ কোষের কোষথাটির সেৰা বাব। আগী কোষে কেবল কোষথাটির মেই। এটি অন্ত পদার্থের তৈরি। কোমো কোমো কোষের থাটিৰে বিশ্র থাকে। এসেৱ ফুগ বাবে। কোষথাটিৰ কোষেৱ আকাৰ পদার্থ কোৱে এবং জেতৰ ও বাইদেৱ যথে কৰল পদাৰ্থ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এৱা ক্ষিতিৰে অংশকে রক্ষা কৰে।

খ) ঘোটোপ্লাজম : কোৰ থাটিৰে অভ্যন্তৰে পোতলা পৰ্মীবেটিক জোলীৰ ম্যায় বকথকে আৰা কৰল অন্তিকে ঘোটোপ্লাজম বলে। একে জীবনেৱ জিষ্ঠি বলা হজ। এৱা ক্ষিতি অংশ, বৰ্থা- কোৰ বিষ্টি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।



চিত্ৰ- ৩.২ : আলোক অকুণীকৰণ বাব ও ইলেক্ট্ৰনিক অকুণীকৰণ যথে সেৰা আগী ও উডিস কোৰ।

১। **কোৰ বিষ্টি :** সম্পূৰ্ণ ঘোটোপ্লাজমকে ছিৱে যে নৱম পৰ্মী সেৰা বায় তাকে কোৰ বিষ্টি বা সেল মেম্ব্ৰেন বলে। এটি কোষেৱ জেতৰ ও বাইদেৱ যথে পানি, খনিজ পদাৰ্থ ও গ্যাস এৱা চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।

২। **সাইটোপ্লাজম :** ঘোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যে অৰ্বত্তৱল অংশটি থাকে, তাকে সাইটোপ্লাজম বলে। এৱা অধাৰণ কাজ কোষেৱ ফুগ ফুগ অসমুক্তোকে ধাৰণ কৰা। কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণীৰ কাজ এখানে সম্পৰ্ক হয় যেন্ত্ৰ-আলোকসংৰেখণ। সাইটোপ্লাজমে সেৰা বায়, এমন কৰেকতি কৃত্রিমেৰ পৰিচিতি নিয়ে দেৱা হোৱা।

২.১। **গ্লাস্টিক :** এজলোকে বৰ্ণাখাৰও বলে। সাধাৰণত আগী কোষে গ্লাস্টিক থাকে না। গ্লাস্টিক উডিস কোষেৱ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। পাতা, ফুল বা ফলেৱ যে বিভিন্ন রঙ আমৰা দেখি তা সবই এই গ্লাস্টিকেৰ কাৰণে। সবুজ গ্লাস্টিক অধাৰণত ধান্য তৈৰিকে সাহায্য কৰে। অন্যান্য মতেৱ গ্লাস্টিকজলো উডিসেৱ বিভিন্ন অসকে রক্ষিত কৰে আকৰণীয় কৰে তোলে। বৰ্ষীন গ্লাস্টিক ধান্য সংৰক্ষ কৰে।

কোৰ : মাটি দিয়ে কোষেৱ একটি মডেল বানাবৎ, যাকে কোষথাটিৰ, কোৰ বিষ্টি, গ্লাস্টিক, নিউক্লিয়াস থাকবে।

২.২। কোষ গহ্বর : পিঁয়াজের কোষ পরীক্ষা করে দেখ। দেখবে যে কোষের মধ্যে বৃহৎ একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এটাকে কোষগহ্বর বলে। নতুন কোষের গহ্বর ক্ষুদ্র বা অনুপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু একটি পরিণত উদ্ভিদ কোষে এ গহ্বরটি বেশ বড়। উদ্ভিদ কোষে অবশ্যই গহ্বর থাকবে। একটি প্রাণী কোষে সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না, তবে যদি থাকে তা হলে সেটি হবে ছোট। কোষগহ্বরে যে রস থাকে, তাকে কোষরস বলে। কোষগহ্বর উদ্ভিদ কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

কোষগহ্বর কোষরসের আধার হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া কোষের উপর কোন চাপ এলে তা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

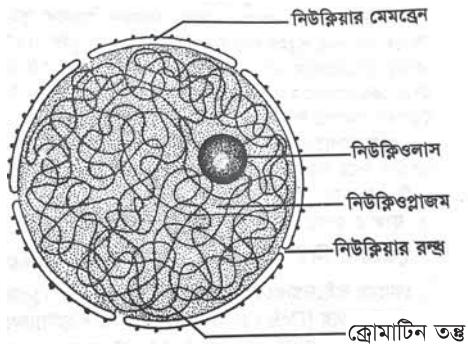
পাঠ ৭-৮ : নিউক্লিয়াস

থ্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান গোলাকার ঘন বস্তুটিকে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াস কোষের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নবীন কোষে এদের অবস্থান কোষের কেন্দ্রে। পরিণত কোষে এদের স্থান পরিবর্তন হতে পারে। এরা গোলাকার তবে কখনও কখনও উপবৃত্তাকার বা নলাকার হতে পারে। কোনো কোনো কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। একটি নিউক্লিয়াস প্রধানত (১) নিউক্লিয়ার আবরণী (২) নিউক্লিয়প্লাজম (৩) ক্রোমাটিন তন্ত্র ও (৪) নিউক্লিওলাস নিয়ে গঠিত।

নিউক্লিয় আবরণী : এটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে। এ আবরণী সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুগুলোকে আলাদা করে রাখে। একই সাথে এটি তরল পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয়প্লাজম : নিউক্লিয়াসের ভিতরের তরল ও স্বচ্ছ পদার্থটিকে নিউক্লিয়প্লাজম বলে। এর মধ্যে ক্রোমাটিন তন্ত্র ও নিউক্লিওলাস থাকে।

নিউক্লিওলাস : নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিন্দুর ন্যায় অতিক্ষুদ্র যে অঙ্গানুটি ক্রোমাটিন তন্ত্রের সাথে লেগে থাকে, সেটিই নিউক্লিওলাস।



চিত্র ৩.৩ : একটি নিউক্লিয়াস

কাজ : মাটি দিয়ে নিউক্লিয়াসের একটি মডেল বানাও যাতে ক্রোমাটিনতন্ত্র ও নিউক্লিওলাস থাকবে।

ক্রোমাটিন তন্ত্র : নিউক্লিয়াসের ভিতরে সুতার ন্যায় কুণ্ডলী পাকানো বা খোলা অবস্থা যে অঙ্গানুটি রয়েছে তাকে ক্রোমাটিন তন্ত্র বলে। এটি জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে। পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে যায়। এরা কোষের বৃদ্ধি বা যেকোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : চিত্র এঁকে অঙ্গানুর ভিত্তিতে একটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের পার্থক্য একটি ছকে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : ক্রোমাটিন তন্ত্র, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয়প্লাজম, সাইটোপ্লাজম।

পাঠ ৯-১০ : জীব দেহে কোষের ভূমিকা

কোষ কী তা তোমরা জেনেছ। কতগুলো কোষ একত্রিত হয়ে যখন একই ধরনের কাজ করে, তখন তাকে কলা বা টিসু বলে। আবার বিভিন্ন ধরনের কলা মিলে একটি তন্ত্র বা অঙ্গপ্রতঙ্গ গঠন করে। কোষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিভিন্ন ধরনের কলা গঠন : অনেকগুলো কোষ সম্মিলিতভাবে একটি কলা ও কলাতন্ত্র গঠন করে। এ ক্ষেত্রে কলায় অবস্থিত সকল কোষ এক ধরনের কাজ করে। পরিবহন, ভারসাম্য রক্ষা করা, দৃঢ়তা প্রদান করা এদের কাজ।

বিভিন্ন অঙ্গ গঠন : বিভিন্ন ধরনের কোষ ও কলা মিলিত হয়ে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করে। যেমন— মূল কাণ্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি। আবার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ষ, লিভার, পিহা, প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ।

জীবের দেহ গঠন : ক্ষুদ্র কোষ থেকে জীবের দেহ সৃষ্টি হয়। ক্রমশ এই কোষ থেকেই জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে।

খাদ্য উৎপাদন : সবুজ উড্ডিদ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। সবুজ উড্ডিদের কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট নামক প্লাস্টিড থাকে। এই ক্লোরোপ্লাস্ট সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সমন্বয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

শক্তি উৎপাদন : জীবের জীবন ধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। খাদ্য থেকে জীব শক্তি পায়।

খাদ্য ও পানি সঞ্চয় : কিছু কিছু উড্ডিদের কোষ পানি সঞ্চয় করে রাখে। আবার কোনো কোনো কোষ খাদ্য মজুদ করে, যেমন : ফনিমনসা, আলু ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও রস নিঃসরণ : বিশেষ করে প্রাণীতে এ ধরনের কোষ দেখা যায়, যার কাজ হলো প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও বিভিন্ন ধরনের রস নিঃসরণ করা। যেমন- পিন্টুরস, ইনসুলিন, জারক রস ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে কি শিখলাম

- জীব দেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বা ‘সেল’ বলে।
- কোটি কোটি কোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত।
- কোষ দুই ধরনের, যথা-আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ।
- সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের মিলিত রূপই প্রোটোপ্লাজম।
- সাইটোপ্লাজমে, প্লাস্টিড, কোষগহ্বর ইত্যাদি থাকে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

- ১। ----- কোষে কোষ প্রাচীর থাকে।
- ২। প্লাস্টিড ----- কোষের বৈশিষ্ট্য।
- ৩। ----- কোষে সাধারণত কোষ গহ্বর থাকে না।
- ৪। কোষ প্রাচীর ----- পদার্থ দ্বারা তৈরি।
- ৫। ----- এর ভিতরে নিউক্লিয়াস ও ক্রোমাটিন তন্ত্র থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ১। একটি প্রাণী কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
- ২। প্লাস্টিডের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ৩। উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় কিন্তু প্রাণী কোষে পাওয়া যায় না; আবার প্রাণী কোষে পাওয়া যায়, কিন্তু উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় না এরপ ক্ষুদ্রাঙ্গ শুলির নাম উল্লেখ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটিতে চিক (✓) চিহ্ন দাও।

- ১। পিয়াজের কোষ উদ্ভিদ কোষ কারণ এতে-

ক) কোষপ্রাচীর আছে	খ) প্লাস্টিড নেই।
গ) কোষগহ্বর নেই।	ঘ) মাইটোকল্রিয়া আছে।
- ২। কোন বিজ্ঞানী জীব কোষ আবিষ্কার করেন?

ক) আইজ্যাক নিউটন।	খ) রবার্ট হক।
গ) লিউয়েন হক।	ঘ) ক্যারোলাস লিনিয়াস।
- ৩। নিউক্লিয়াসের কাজ কী?

ক) কোষের আকার ও আকৃতি ঠিক রাখা।	খ) খাদ্য সংগ্রহের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা।
গ) কোষের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা।	ঘ) সাইটোপ্লাজম ধারণ করা।

সূজনশীল প্রশ্ন :

১. দীপ্তি বাবার সাথে ঢাকায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যায়। গার্ডেনে সে বিভিন্ন বর্ণের গাছপালা দেখতে পায়। পরবর্তীতে সে পার্শ্ববর্তী চিড়িয়াখানায় যায়। সেখানে সে বিভিন্ন প্রাণী দেখতে পায়।

- ক. নিউক্লিয়াস কী?
- খ. কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র কোনটি? ব্যাখ্যা কর।
- গ. দীপ্তির পর্যবেক্ষণকৃত উদ্ভিদগুলো বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দীপ্তির দেখা জীবগুলোর কোষীয় বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর।

২.



ক. কোষ কী?

খ. জনন কোষ বলতে কী বুঝায়?

গ. তারকাচিত্রে অবস্থিত প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাঙ্গ ব্যবহার করে প্রাণী কোষের একটি চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।

ঘ. উদ্ভিদে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারকাচিত্রে অবস্থিত কোন ক্ষুদ্রাঙ্গটি ভূমিকা পালন করে থাকে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

নির্জেরা কর :

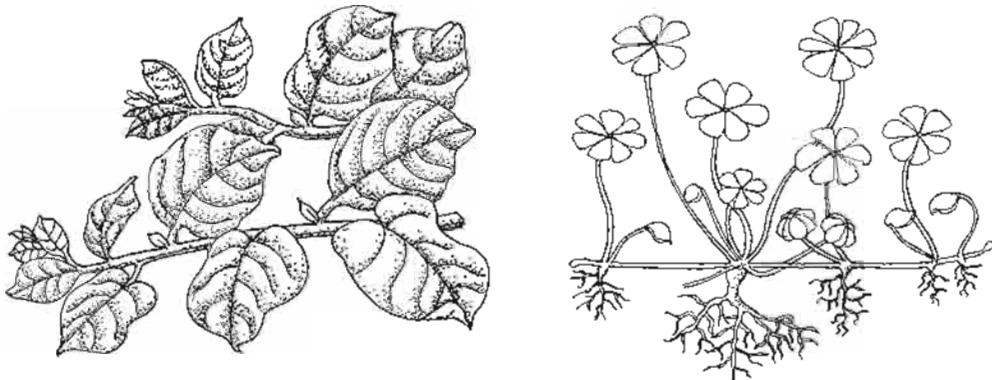
১। মাটি দিয়ে একটি জীবকোষের মডেল বানাও এবং এর বিভিন্ন অংশ কাগজের ফ্ল্যাগ দিয়ে চিহ্নিত কর।

২। তোমরা দলবদ্ধভাবে উদ্ভিদ কোষের প্রয়োজনীয়তা লিখ ও তা প্রেরণিতে উপস্থাপন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ধিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

ইতোপূর্বে আমরা বিভিন্ন প্রকার উদ্ধিদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জানি, উন্নত উদ্ধিদ দুই ধরনের যথা নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ধিদ। আবৃতবীজী উদ্ধিদকে একটি আদর্শ উদ্ধিদ হিসাবে ধরে তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী তা আমরা এ অধ্যায়ে জানব। একটি সপুষ্পক উদ্ধিদের কোন কোন অংশ থাকে, কোথায় তাদের অবস্থান তা জানব। এর প্রধান অংশগুলোর প্রকারভেদ, কাজ ও মানবজীবনে এসব অঙ্গের অবস্থান কী তা আলোচনা করা হবে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা

- ১। উদ্ধিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ২। মূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ৩। কাণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ৪। পাতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ৫। উদ্ধিদ এবং মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ৬। উদ্ধিদ ও প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

পাঠ-১ : সপুষ্পক উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

আমরা চারপাশের পরিবেশে অগণিত উদ্ভিদ দেখতে পাই। এসব উদ্ভিদের আকার ও গঠনে অনেক বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু উদ্ভিদের দেহে মূল কাণ্ড ও পাতা থাকে। এদের ফুল, ফল ও বীজ হয়। এদের সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে, যেমন- আম, জাম, ছোলা, লাউ, ধান, গম ইত্যাদি। ধান, গম, ঘাস একবীজপত্রী ও আম, কাঁঠাল, সরিষা, মরিচ দ্বিবীজপত্রী সপুষ্পক উদ্ভিদ। আবৃতবীজী সপুষ্পক উদ্ভিদকে আদর্শ উদ্ভিদ বলা হয় কারণ এরা সর্বোচ্চ উদ্ভিদ।

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করা যায়।

বিটপ : উদ্ভিদের যে অংশগুলো মাটির উপরে থাকে তাদের একত্রে বিটপ বলে। বিটপে কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল থাকে। কাণ্ডে পর্ব, পর্বমধ্য ও শীর্ষ মুকুল থাকে। ফুলগুলো

পাতার কক্ষে উৎপন্ন হয়। ফুলে বৃত্তি, দল, পুঁকেশর ও গর্ভাশয় থাকে। এ কথাগুলোর সাথে পাশের পরিচিত মরিচ গাছের চিত্র মিলিয়ে দেখি।

১। **কাণ্ড :** প্রধান মূলের সাথে লাগান মাটির উপরে উদ্ভিদের যে অংশ থাকে, তাকে কাণ্ড বলে। কাণ্ডের গায়ে পর্ব ও পর্ব মধ্য থাকে। পর্ব থেকে পাতা উৎপন্ন হয়। কাণ্ড পাতা ও শাখা প্রশাখার ভার বহন করে।

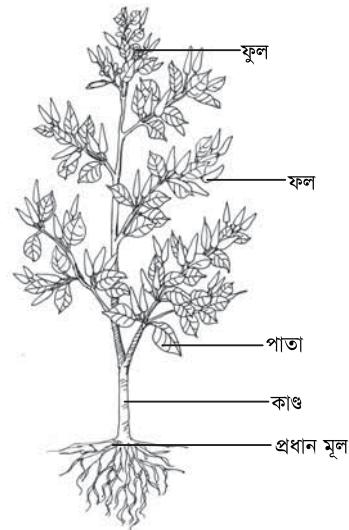
২। **পাতা :** শাখা প্রশাখার গায়ে যে চ্যাপ্টা সবুজ অঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে পাতা বা পত্র বলে। পাতায় খাদ্য তৈরি হয়।

৩। **ফুল :** পত্র কক্ষে সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল হয়। এই ফুল থেকে ফল অর্থাৎ মরিচ হয়।

৪। **ফল :** ফুল বৃড়ি হয়ে ঝারে যায়। ঝরা ফুলের গোড়ায় ফুলের যে অংশটি থেকে যায় তা বড় হয়ে ফল সৃষ্টি করে। গর্ভাশয়ই বড় হয়ে ফলে পরিণত হয়। মরিচ গাছের ফলই মরিচ।

মূল : উদ্ভিদের যে অংশ পর্ব, পর্বমধ্য ও অগ্রমুকুলবিহীন তাকেই মূল বলে। সাধারণত মানুষ মনে করে উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশই মূল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বক্তব্যটি সত্য তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কাণ্ড বা পত্র, ফুল, ফল মাটির নিচের জন্মে, যেমন- আদা, হলুদ, পিয়াজ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে উপরের শ্রেণিতে তোমরা বিশদ জানতে পারবে।

কাজ : বিদ্যালয়ের পাশে থেকে ছোট একটি গাছ মূলসহ তুলে আন। এবার তার চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।



চিত্র-৪.১: একটি মরিচ গাছের বাহ্যিক গঠন।

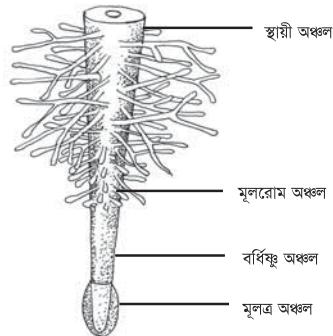
সাধারণত মূল জ্বরমূল হতে উৎপন্ন হয়। মূলে পাতা, ফুল বা ফল হয় না। সাধারণত মূল নিম্নগামী। ভূগর্ভস্থ বৃদ্ধি পেয়ে প্রধান মূল গঠন করে। প্রধান মূল থেকে শাখা মূল, শাখা মূল থেকে প্রশাখা মূল উৎপন্ন হয়।

নতুন শব্দ : আদর্শ, সপুষ্পক, বিটপ, কাণ্ড, পর্ব, পর্বমধ্য, ভূগর্ভস্থ মূল।

পাঠ-২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ

মূলের বিভিন্ন অংশ : মূলকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। এর শেষ প্রান্তে যে টুপির মতো অংশ থাকে তাকে মূলটুপি বা মূলত্ব বলে। আগাম থেকে মূলকে রক্ষা করা এর কাজ। এর পেছনের মস্ত অংশকে বর্ধিষ্ঠ অংশল বলে। এ স্থানে মূলের বৃদ্ধি ঘটে। এই এলাকার পেছনে সূক্ষ্ম লোমশ অংশলকে বলে মূলরোম অংশল। মূলরোম দিয়ে উত্তিদি পানি শোষণ করে। এই অংশলের পর মূলের স্থায়ী এলাকা অবস্থিত। স্থায়ী অংশল থেকে মূলের শাখা ও প্রশাখা সৃষ্টি হয়।

নূতন শব্দ ৪ : মূলরোম, মূলটুপি, মূলত্ব।



চিত্র-৪.২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ।

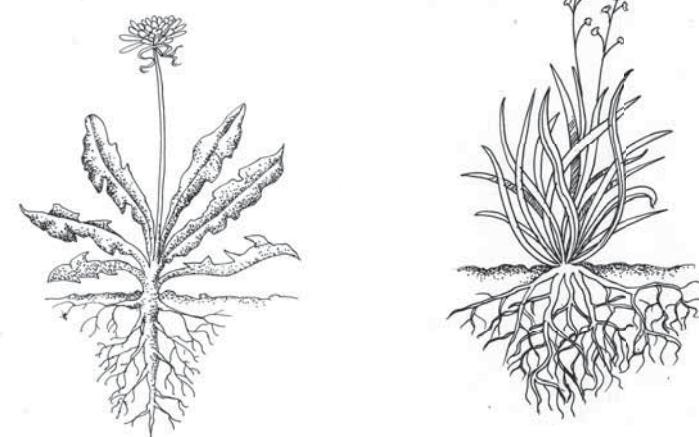
পাঠ ৩-৪ : মূলের প্রকার ভেদ ও কাজ

সব গাছের মূল কী এক ধরনের হয়? ধানের মূল আর আম গাছের মূল কি এক ধরনের? বটের ঝুরিও আসলে এক ধরনের মূল। উত্তিদের প্রয়োজনে এ মূলগুলো ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। বটের ঝুরিমূল, কেয়া গাছের ঠেশমূল, পানের আরোহী মূল উত্তিদের প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের কাজ করে।

আমরা খেয়াল করলে দেখব যে, সকল ধরনের উত্তিদের মূল এক রকমের নয়। একটি মরিচ বা একটি আম গাছের মূল অবশ্যই ধান, ভুট্টা বা ঘাস এর মূল হতে ভিন্ন রকমের। এরূপ ভিন্নতার জন্য মূলকে এর উৎপত্তি ও অবস্থান অনুযায়ী প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১। স্থানিক মূল ও ২। অস্থানিক মূল।

১। স্থানিক মূল : এ ক্ষেত্রে জ্ঞানমূল বৃদ্ধি পেয়ে সরাসরি মাটির ভিতর প্রবেশ করে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এসব মূলকে স্থানিক মূল বলে, স্থানিকমূলে প্রধান মূল থাকে। যথা- মুলা, আম, জাম, মরিচ, সরিষা ইত্যাদি উত্তিদের মূল।

যেসব উত্তিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে তাদের দ্বিবীজপত্রী উত্তিদি বলে। দ্বিবীজপত্রী উত্তিদের প্রধান মূল এবং এর শাখা-প্রশাখা নিয়ে যে মূলতন্ত্র গঠিত হয় তাকে স্থানিক মূলতন্ত্র বলা হয়। আম, জাম, মরিচ, সরিষা, নয়নতারা প্রভৃতি উত্তিদে এ ধরনের মূলতন্ত্র রয়েছে।



চিত্র-৪.৩ : স্থানিক মূল ও অস্থানিক মূল।

কাজ : মূলসহ একটি মরিচের চারা ও একটি ধানের চারা সংগ্রহ কর। এদের মূলের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তার তালিকা কর।

২। অস্থানিক মূল : যেসব মূল জনগুল থেকে উৎপন্ন না হয়ে কাণ্ড ও পাতা থেকে উৎপন্ন হয় তাকে অস্থানিক মূল বলে। এরা দুই ধরনের। যথা- ক) গুচ্ছ মূল ও খ) অগুচ্ছ মূল।

ক) গুচ্ছ মূল : ধান, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল সক্ষ করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ডের নিচের দিকে এক গুচ্ছ সরু মূল সৃষ্টি হয়েছে। এদের গুচ্ছমূল বলে। জনগুল নষ্ট হয়ে সে স্থান থেকেও গুচ্ছ মূল উৎপন্ন হতে পারে। যেমন- ধান, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি।

খ) অগুচ্ছ মূল : যেসব মূল একত্রে গাদাগাদি করে গুচ্ছাকারে জন্মায় না বরং পরম্পর থেকে আলাদা থাকে, তাদের অগুচ্ছ মূল বলে। কেবল গাছের টেশমূল, বটের মুরিমূল এ ধরনের অগুচ্ছ মূল।

কাজ : মূলসহ একটি ধানের চারা, সরিবার চারা, ঘাস, তুল এনে দেখ নারিকেল গাছের মূলের সাথে কোন কোনটি মিলে এবং অধিল কোথায় উল্লেখ কর।

ক্লাসের সব বঙ্গ মিলে মূলের কাণ্ডের একটি তালিকা তৈরি কর।

মূল নিষ্পত্তিশীত কাজসমূহ করে থাকে :

১। মূল উদ্ভিদটিকে মাটির সাথে শক্তভাবে আটকে রাখে ফলে বাঢ় বাতাসে সহজে হেলে পড়ে না। ২। মূল মাটি থেকে পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ করে। আমরা জানি, মূলে মূলরোম অঞ্চল বলে একটি অংশ থাকে। এখানে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গোম উৎপন্ন হয় যার মাধ্যমে উদ্ভিদ পানি ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে।

নতুন শব্দ : প্রধানমূল, স্থানিকমূল, অস্থানিকমূল, গুচ্ছমূল, শোষণ, মূলরোম।

পার্ট-৫ : কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

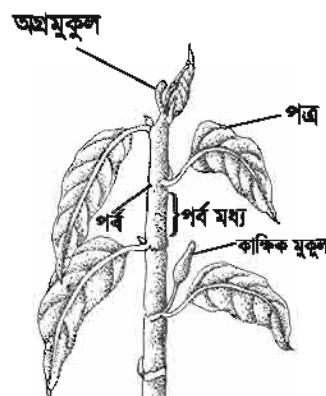
আমরা যখন আম পাড়তে গাছে উঠি, তখন মাটির ওপরে গাছের খাড়া সবা অংশটি আঁকড়ে ধরে তবেই গাছে উঠি। এটাই গাছের কাণ্ড। কুল গাছের যে ভালে বসে কুল থাই এগলো শাখা। গাছের শাখাও কিন্তু কাণ্ডেই অংশ। উদ্ভিদের যে অংশ থেকে শাখা-শাখা, পাতা উৎপন্ন হয়, তাকে কাণ্ড বলে। এতে পর্ব, পর্বমধ্য ও মুকুল থাকে।

১। **পর্ব :** কাণ্ডের যে স্থান থেকে পাতা বের হয় তাকে পর্ব বা সজি বলে।

২। **পর্বমধ্য :** পাশাপাশি দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে পর্বমধ্য বলে। পর্বমধ্য গাছকে খাড়া রাখতে ও বৃক্ষিতে সহায়তা করে। পর্বমধ্য থেকে কোনো ধরনের মূল, পাতা বা শাখা সৃষ্টি হয় না।

৩। **মুকুল :** কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে পত্রকক্ষ বলে।

সাধারণত মুকুল এ পত্রকক্ষে জন্মে। তবে শাখার অস্থানাগোও মুকুল সৃষ্টি হয়। পত্রকক্ষে যে মুকুল থাকে, তাকে কান্দিক মুকুল এবং কাণ্ড বা শাখার অস্থানাগো যে মুকুল জন্মে তাকে শীর্ষ মুকুল বলে।



চিত্র-৫.৪ একটি শাখা কাণ্ড।

কাজ : একটি বৃক্ষ হতে ছেষটি একটি শাখা নিয়ে তার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা কর। এবার এর চিত্র আঁক এবং অংশগুলি চিহ্নিত করে দেখাও।

নতুন শব্দ : শীর্ষমুকুল, পত্রকক্ষ, পর্ব, পর্বমধ্য, কান্দিক মুকুল।

পাঠ-৬ : কাণ্ডের শ্রেণিকরণ

একটি আম গাছের কাণ্ড, একটি লাউগাছের কাণ্ড একটি নারকেল গাছের কাণ্ড লক্ষ করি। কোনোটির কাণ্ড বেশ শক্ত, কোনোটি দুর্বল আবার কোনোটির মধ্যে কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। এ থেকে ধারণা করা যায় যে কাণ্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে? তবে এদের প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা-১) সবল কাণ্ড ও ২) দুর্বল কাণ্ড।

১) সবল কাণ্ড : যেসব কাণ্ড শক্ত ও খাড়াভাবে গাছকে দাঁড়াতে সাহায্য করে তাদের সবল কাণ্ড বলে, যেমন : আম, জাম, নারিকেল, তাল ইত্যাদি গাছের কাণ্ড। এই কাণ্ডগুলোর কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে। কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে না।

ক) অশাখ : এসব কাণ্ডের কোনো শাখা হয় না। কাণ্ডটি লম্বা হয়ে বেড়ে ওঠে। এর শীর্ষে পাতার মুকুট থাকে। খেয়াল করলে দেখবে নারিকেল, তাল, সুপারি গাছের কাণ্ড এ ধরনের হয়।

খ) শাখাস্থিত কাণ্ড :

১. মঠ আকৃতি : কোনো কোনো গাছে প্রধান কাণ্ডটি থেকে এমনভাবে শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয় যে পূর্ণসং গাছটিকে একটি মঠের ন্যায় দেখায়। এ গাছের নিচের দিকের শাখাগুলো বড় এবং ক্রমাগতে উপরের দিকের শাখাগুলো ছোট হয়ে থাকে।

সম্পূর্ণ গাছটি নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মঠের ন্যায় আকার ধারণ করে। দেবদারু, বিলেতি বাউ ইত্যাদি গাছে এ ধরনের কাণ্ড দেখা যায়।

২. গম্ভুজ আকৃতি : কোনো কোনো গাছের প্রধান কাণ্ডটি খাটো ও মোটা হয় এবং শাখা ও প্রশাখাগুলো এমনভাবে এই প্রধান কাণ্ডে বিন্যস্ত হয় যে গাছটিকে একটি গম্ভুজের ন্যায় দেখায়, যেমন- আম, কঁঠাল, জাম ইত্যাদি।

৩. তৃণ কাণ্ড : এসব কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য খুবই স্পষ্ট। পর্ব থেকে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যথা- বাঁশ, আখ ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে এসব কাণ্ডের পর্বগুলো ফাঁপা বা ভরাট হতে পারে।

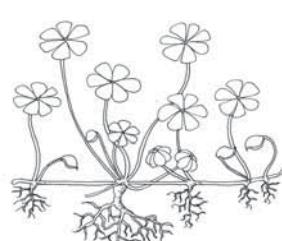
২) দুর্বল কাণ্ড : কিছু উল্লিদের কাণ্ড খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে না তাই মাটিতে বা মাচার উপরে বৃদ্ধি পায়। এদের কাণ্ডে সাধারণত কাষ্ঠ থাকে না তাই এরা দুর্বল ও নরম। এদের কোনোটি লতানো, কোনোটি শয়ান আবার কোনোটি আরোহী।



চিত্র- ৪.৫ : অশাখ, মঠ আকৃতি, গম্ভুজ আকৃতির কাণ্ড।



চিত্র- ৪.৬ : টেইলার বা শয়ান কাণ্ড।

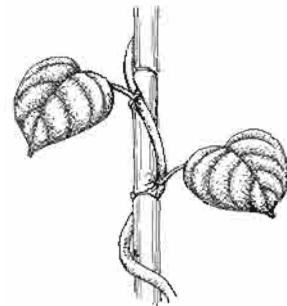


চিত্র- ৪.৭ : ক্রিপার বা লতানো কাণ্ড।

ক) ক্রিপার বা লতানো : এসব কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে সমান্তরালভাবে বৃক্ষ পাই। এদের প্রতিটি পর্ব থেকে গুচ্ছমূল বের হয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, যেমন- ঘাস, আমরুলী ইত্যাদি।

খ) ট্রেইলার বা শয়ান : যেসব কাণ্ড মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে মূল বের হয় না, এদের ট্রেইলার বা শয়ান কাণ্ড বলে, যথা- পুই, মটরস্ট্রিট।

গ) আরোহিণী : যে সকল কাণ্ড কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে উপরের দিকে বেড়ে ওঠে, তাদের ফ্লাইশার বা আরোহিণী বলে, যথা- শিম, পান, বেত ইত্যাদি।



চিত্র-৪.৮ : আরোহিণী কাণ্ড।

কাজ : তোমরা দল বেঁধে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে সুরে সুরে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড পর্যবেক্ষণ কর এবং কোন গাছের কাণ্ড কী ধরণের তা খাতায় নোট কর। শ্রেণিতে কিন্তে কাণ্ডের শ্রেণিকরণ কর।

পাঠ-৭ : কাণ্ডের কাজ

গাছের কাণ্ড কী কী কাজ করে অনুমান করে তোমার খাতায় লিখ। এবার নিচের তালিকার সাথে তোমার তালিকা মিলিয়ে দেখ।

- ১। কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল এবং শাখা-প্রশাখার ভারবহন করে।
- ২। কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতাকে আলোর দিকে তুলে ধরে যাতে সূর্যের আলো যথাযথভাবে পায়।
- ৩। কাণ্ডের শোষিত পানি, খনিজ লবণ শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুলে এবং ফলে পরিবহন করে।
- ৪। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য কাণ্ডের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
- ৫। কচি অবস্থায় সবুজ কাণ্ড সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করে।

কাজ : একটি তাল, আম ও সুপারি গাছের কাণ্ড কী কী কাজ করে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-৮ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ

কাণ্ড বা তার শাখা-প্রশাখার পর্ব থেকে পাশের দিকে চ্যাপ্টা যে অঙ্গটি উৎপন্ন হয় তাকে পাতা বলে। পাতা সাধারণত চ্যাপ্টা ও সবুজ বর্ণের হয়। নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে পাতা থাকে না। তবে ফার্ন ও মস জাতীয় উদ্ভিদে পাতার ন্যায় অঙ্গ থাকে। মসের পাতা প্রকৃত পাতা নয়।

যে পাতায় পত্রমূল, বৃক্ষ ও ফলক এ তিনটি অংশ থাকে তাকে আদর্শ পাতা বলে, যেমন : আম, জবা।

পাতার বিভিন্ন অংশ

একটি জবা পাতা নিয়ে পরীক্ষা করলেই এর তিনটি অংশ দেখা যাবে, যেমন- ১) পত্রমূল, ২) বৃত্ত বা বোঁটা ও ৩) পত্রফলক।

১। **পত্রমূল :** পাতার যে অংশ কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার গায়ে মুক্ত থাকে, তাকে পত্রমূল বলে। কোনো কোনো উষ্ণিদের পত্রমূলের পাশ থেকে ছোট পত্রসদৃশ অংশ বের হয়। এদের উপর পত্র বলে। মটর গাছের পত্রমূলে একপ উপপত্র দেখা যায়।

২। **বৃত্ত বা বোঁটা :** পাতার দণ্ডকার অংশটিকে বৃত্ত বা বোঁটা বলে। বৃত্ত বা বোঁটা পত্রমূল ও ফলককে মুক্ত করে। শাপলা, পঁজ ইত্যাদি উষ্ণিদের বৃত্ত খুব লম্বা হয়। আবার শিয়াল কাঁটা গাছের পাতায় কোনো বোঁটাই থাকে না।



চিত্র-৪.৯ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ।

কাজ : কাছাকাছি থেকে বেকোনো একটি গাছের পাতা সংগ্রহ কর, পর্যবেক্ষণ কর ও চিত্র আঁক।

বৃত্ত বা বোঁটা পত্র ফলককে এমনভাবে ধরে রাখে, যাতে সবচেয়ে বেশি সুর্যের আলো পেতে পারে। এ ছাড়া কাণ্ড আর ফলকের মধ্যে পানি, খনিজ লবণ ও তৈরি খাদ্যের আদান-প্রদান করা এর কাজ।

৩। **পত্র ফলক :** পত্র বৃত্তের উপরে চ্যাপ্টা সবুজ অংশটিকে ফলক বলে। বৃত্তশীর্ষ হতে যে মোটা শিরাটি ফলকের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে মধ্যশিরা বলে। এই মধ্যশিরা থেকে শিরা-উপশিরা উৎপন্ন হয়। ফলকের কিনারাকে পত্র কিনারা বলে।

পাতার সাধারণ কাজ : একটি পাতার সাধারণ কাজগুলি নিচে দেয়া হলো :

ক) খাদ্য তৈরি করা পাতার সর্বপ্রধান কাজ। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।

খ) গ্যাসের আদান প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়। আবার খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বের করে দেয়।

গ) উষ্ণিদ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পানি গ্রহণ করে থাকে। এই অতিরিক্ত পানি পাতার সাহায্যে বাঞ্চাকারে বাইরে বের করে দেয়।

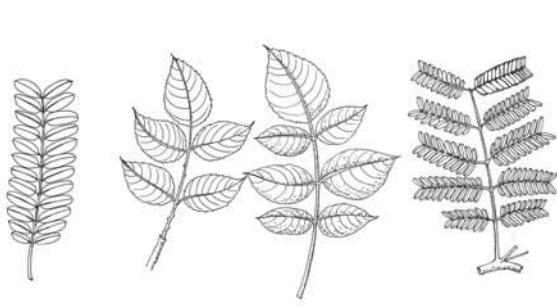
নতুন শব্দ : পত্রমূল, বৃত্ত বা বোঁটা, পত্রফলক।

পাঠ- ৯ : পত্রের প্রকারভেদ

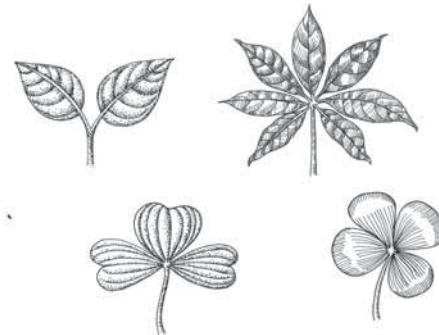
একটি আমের পাতা ও একটি তেঁতুলপাতা হাতে নিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে আমপাতার ফলকটি অখণ্ডিত। বিভিন্ন তেঁতুলপাতাটির ফলক স্কুল স্কুল অংশে খণ্ডিত। পত্রফলকের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পত্রকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১) সরল পত্র ও ২) ঘোগিক পত্র।

১। **সরল পত্র :** যে পত্রে বৃত্তের উপরে একটিমাত্র পত্রফলক থাকে, তাকে সরলপত্র বলে। আম, জাম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি উষ্ণিদের পাতা সরলপত্র। একটি সরল পত্রের বিনারা অখণ্ডিত বা অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত থাকে।

২। যৌগিক পত্র : গোলাপ, নিম, তেঁতুল, সজনে ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পাতায় অনেকগুলো ছোট ছোট ফলক থাকে। এদের অগুফলক বলে। যৌগিক পত্রের ফলকটি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয় এবং খণ্ডিত অংশগুলো পরস্পর হতে আলাদাভাবে অগুফলক সৃষ্টি করে। অগুফলক বা পত্রকগুলো যে দণ্ডে সাজানো থাকে তাকে র্যাকিস বা অঙ্ক বলে। বিভিন্ন ধরনের পক্ষল যৌগিক পত্র রয়েছে। পত্রকের বিন্যাস অনুযায়ী যৌগিক পত্র দুই ধরনের, যথা- i) পক্ষল যৌগিক পত্র এবং ii) করতলাকার যৌগিক পত্র।



চিত্র-৪.১০ : বিভিন্ন রকমের পক্ষল যৌগিক পত্র।



চিত্র-৪.১১ : বিভিন্ন রকমের করতলাকার যৌগিক পত্র।

নতুন শব্দ : সরলপাতা, যৌগিক পাতা, মধ্যশিরা।

পাঠ- ১০ : মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা

আমরা উদ্ভিদের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ, ঔষধ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্ৰী আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই। প্রাণী থেকে প্রাণ দ্রব্যাদিও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদেই অবদান।

ক) মূলের ব্যবহার : মূলা, গাজর, শালগম ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল উপাদেয় সবজী। শতমূলী, সর্পগন্ধা ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল থেকে দামি ঔষধ তৈরি হয়।

খ) কাণ্ডের ব্যবহার : বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের নরম কাণ্ড আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। গোল আনু, আদা, পুঁই, ডাটা, কচু বা ওলকচুর কাণ্ড আমরা সবজি হিসেবে গ্রহণ করি। খেজুর ও আখের কাণ্ড হতে পাওয়া রস উপাদেয় পানীয়। বড় বড় কাণ্ড থেকে আমরা ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পেয়ে থাকি। পাট বা শশের কাণ্ড থেকে প্রাণ আঁশ দিয়ে দড়ি, ছালা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি হয়।

গ) পাতার ব্যবহার : লাউশাক, পুঁইশাক, লালশাক, পালং, পাটশাক ও কলমিশাক ছাড়াও আরও নানা ধরনের শাক আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। কলা, তাল, আনারস গাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়। এই আঁশ দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। তালপাতা ও গোলপাতার ছাউনি দেয়া ঘর তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামাক পাতা থেকে বিড়ি-সিগারেট প্রস্তুত হয়।

এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ। খেজুর পাতা দিয়ে সুন্দর পাটি তৈরি হয়। তালপাতার পাথা তোমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকবে। বাসক, নিশিন্দা, কুচি, থানকুনি, গাঁদা ইত্যাদি গাছের পাতা থেকে মূল্যবান ঔষধ পাওয়া যায়।

নতুন শব্দ : মূল, কাণ্ড, মূলত্ব, অংকুর, জ্বর, শিরা, ফলক, বৃত্ত, পাঠ, রূপান্তর, যৌগিকপত্র।

পাঠ-১১ : উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি

এবার বুবাতে পারছ যে উদ্ভিদ আমাদের কত উপকার করে। এ জন্য উদ্ভিদের বেশি বেশি যত্ন করা দরকার। অকারণে কখনও গাছ কাটবে না বা গাছের ডাল ভাঙবে না। তোমার-আমার বলে কথা নেই, গাছ জাতীয় সম্পদ ও পৃথিবীর জলবায়ু সংরক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। খুব, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকাতেও গাছের যত্ন অতীব প্রয়োজনীয়। এসো আমরা অধিক গাছ লাগাই ও তার যত্ন নিই এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করি। পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়া খুবই প্রয়োজন। গৃহপালিত পশু-পাখি আমাদের কত যে উপকার করে তা সবাই জান। বনের পশুপাখিও প্রকৃতির সম্পদ। এদেরও যত্ন নিতে হবে। অনর্থক পশুপাখি ধ্বংস করব না। অতিথি পাখি শিকার করব না। এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করা দরকার।

কাজ : গাছের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি র্যালি আয়োজন কর।

এ অধ্যায়ে কী শিখলাম :

- মূল পানি শোষণ করে এবং গাছকে মাটির সাথে বেঁধে রাখে। মূল দুই ধরনের স্থানিক ও অস্থানিক।
- কাণ্ড শাখা, পাতা ও ফল-ফুলের ভার বহণ করে।
- বৃক্ষের প্রধান কাণ্ডটিকে গুঁড়ি বলে। কাণ্ড প্রধানত দুই ধরনের সবল কাণ্ড ও দুর্বল কাণ্ড।
- পর্ব থেকে সৃষ্টি পার্শ্বীয় চ্যাগ্টা ও সরুজ অংশকে পাতা বলে। পাতা দুই ধরনের, সরল ও যৌগিক।

অনুশীলনী

উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। একটি সরল পত্রের প্রধান শিরাকে ----- বলা হয়।
- ২। অখণ্ড পত্র ফলক আছে এবং পত্রকে ----- পত্র বলে।
- ৩। সচূড় পক্ষল যৌগিক পত্রের শীর্ষে ----- পত্রক থাকে।
- ৪। স্থানিক মূল বড় হয়ে যে মূল সৃষ্টি করে তাকে ----- মূল বলে।
- ৫। জনমূল নষ্ট হয়ে গুচ্ছাকারে যে মূল সৃষ্টি হয় তাকে ----- বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। পত্রবৃন্ত কী? এর অবস্থান কোথায়?
- ২। পত্রের কাজ কী?
- ৩। সরল পত্রের প্রধান শিরাকে কী বলে?
- ৪। যৌগিক পত্রের রেকিস কী?
- ৫। যৌগিক পত্র কাকে বলে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে কী বলে ?
 ক. পর্ব
 খ. মুকুল
 গ. পর্বমধ্য

২. আধ ভূগ কাণ্ড | কারণ -

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| i. কাণ্ড খাট ও মোটা | ii. পর্ব ও পর্বমধ্য খুবই স্পষ্ট |
| iii. পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয় | |
| নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুকিয়া বেগম তার বাড়ির আশ্চর্য প্রথম বছর কুমড়া এবং পরবর্তী বছর পুরুশাক আবাদ করলেন।

৩. সুকিয়া বেগমের প্রথম বছর আবাদকৃত উদ্ভিদটির কাণ্ডের প্রকৃতি কীরূপ?

- | | |
|---|------------------------------|
| ক. ভূগ | খ. লতানো |
| গ. শাখানো | ঘ. আরোহিণী |
| ৪. সুকিয়া বেগমের বিভীষণ বছরে আবাদকৃত উদ্ভিদের কাণ্ডের ক্ষেত্রে বলা যায়- | |
| i. এটি মাটির উপরে ছাঢ়িয়ে পড়ে | ii. পর্ব থেকে মূল বের হয় না |
| iii. অবশ্যনকে আঁকড়ে ধরে বৃক্ষ লাভ করে | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

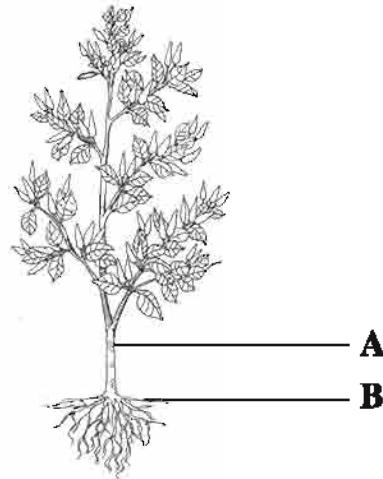
সূজনশীল প্রশ্ন :

১। ক. একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের কী কী অংশ থাকে।

খ. A অংশের কাজ ব্যাখ্যা কর।

গ. A ও B এর মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর।

ঘ. A ও B এর গুরুত্ব আলোচনা কর।



২। প্রাণি ও প্রমিত ছুটিতে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায়। একদিন তারা

গ্রামে ঘুরতে বেড়িয়ে উদ্ভিদ কাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষ করল। এদের মধ্যে কোনটির শাখা-প্রশাখার বিন্যাস মঠ আকৃতির, আবার কোনটির গম্বুজ আকৃতির। এই কাণ্ডগুলোর আকৃতি ও কাজ সম্পর্কে জানতে তারা কোনো জোর না দিল।

ক. মূল কাকে বলে?

খ. আম গাছের পাতার ধরন ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রাণি ও প্রমিত পর্যবেক্ষণকৃত উদ্ভিদ কাণ্ডের কাজ বর্ণনা কর।

ঘ. তৃষ্ণি কীভাবে প্রাণি ও প্রমিত পর্যবেক্ষণকৃত কাণ্ডের শাখা-প্রশাখার বিন্যাসকে আলাদা করবে? ব্যাখ্যা কর।

নিজে কর :

তোমরা দল বেঁধে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড, পাতা ও মূল পর্যবেক্ষণ কর এবং কোন গাছের কাণ্ড, পাতা ও মূল কী ধরনের তা খাতায় নোট কর। শ্রেণিতে ফিরে এদের শ্রেণিকরণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সালোকসংশ্লেষণ

খাদ্য গ্রহণ জীবের বৈশিষ্ট্য তা তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়েছ। এ খাদ্য কোথা থেকে আসে, তা কি তোমরা জান? সবুজ উত্তিদ ছাড়া অন্য কোনো জীব খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। উত্তিদ নিজে প্রস্তুতকৃত খাদ্য ব্যবহার করে তার দেহের বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজে লাগায়। সবুজ উত্তিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে। এ অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমরা জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- ১) উত্তিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ২) সালোকসংশ্লেষণের উপরে জীবজগতের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ৩) খাদ্য প্রাপ্তিতে উত্তিদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং উত্তিদের প্রতি সংবেদনশীল হব।

পাঠ ১-২ : সালোকসংশ্লেষণ কী?

কাজ করার জন্য শক্তি লাগে তা সে কাজ কোনো যন্ত্র করুক বা কোনো জীবই করুক। মোটরগাড়ি চলে পেট্রোল বা ডিজেলের শক্তি দ্বারা। তোমার শ্রেণিকক্ষের পাখা ঘুরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। আমরা যে ইঁটা চলা করি, নানা ধরনের কাজ করি তার জন্যও তো শক্তি লাগে। সে শক্তি কোথা থেকে আসে? জীবেরা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সেই শক্তি পেয়ে থাকে। এখন খাবারের মধ্যে শক্তি এলো কেমন করে। আমরা জানি, পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। সবুজ উত্তিদুকুল নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করে। তারা খাবারের মধ্যেই সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে। যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় সবুজ উত্তিদেরা তাদের নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তার নামই হলো সালোকসংশ্লেষণ। একমাত্র সবুজ উত্তিদেরাই এ কাজটি করতে পারে।

মনে করি, উত্তিদের পাতার সবুজ প্লাস্টিড সালোকসংশ্লেষণে অংশ নেয়। এ প্লাস্টিডের ভিতরে সৌরশক্তি, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন, গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে।

পাতাকে সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থানরূপে কেন গণ্য করা হয়। কারণ-

১. পাতা চ্যাপ্টা ও সম্প্রসারিত হওয়ায় বেশি পরিমাণ সূর্যরশ্মি এবং অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষিত হয়।
২. পাতার কোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা অনেক বেশি।
৩. পাতায় অসংখ্য পত্ররক্ত থাকায় সালোকসংশ্লেষণের সময় গ্যাসীয় আদান প্রদান সহজে ঘটে।

স্তলজ উত্তি থেকে মূলরোম দ্বারা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে। নিমজ্জিত জলজ উত্তিদগুলো দেহতল দিয়ে পানি সংগ্রহ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলো একটি অপরিহার্য উপাদান। আলোর প্রধান উৎস সূর্যালোক। সবুজপাতায় আপত্তিত সূর্যালোকের খুব সামান্য অংশই সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

পাঠ ৩-৬ : সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি

সালোকসংশ্লেষণ একটি শারীরবৃত্তীয় জটিল প্রক্রিয়া। সালোকসংশ্লেষণের সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররক্ষের ভিতর দিয়ে পাতায় প্রবেশ করার পর সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে ও শর্করা উৎপন্ন করে। সালোকসংশ্লেষণের সামগ্রিক বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দুটি পৃথক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। পর্যায় দুটি হলো- (১) আলোক পর্যায়, (২) অন্ধকার পর্যায়। এ বিষয়ে প্রবর্তী শ্রেণিতে আরও বিশদ জানতে পারবে।

সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমণ পরীক্ষা :

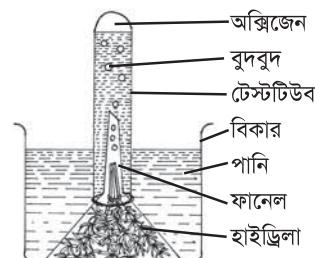
পরীক্ষার উপকরণ : একটা বিকার, একটা ফানেল, একটা টেস্টচিউব, পানি, সতেজ জলজ উদ্বিদ হাইড্রিলা ও একটা দিয়াশলাই।

বিকারটির দুই-তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করি। সতেজ হাইড্রিলা উদ্বিদগুলো বিকারের পানিতে রেখে ফানেল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিয় যাতে হাইড্রিলা উদ্বিদগুলোর কাণ্ডগুলো ফানেলের নলের উপরের দিকে থাকে।

এরপর বিকারে আরও পানি ঢালি যাতে ফানেলের নলটা সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডুবে থাকে। এবার টেস্টচিউবটা পানি দিয়ে পূর্ণ করে বৃন্দাঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে ফানেলের নলের উপর উল্টিয়ে দিয় এমনভাবে, যাতে টেস্টচিউবের পানি বের না হয়ে যায়। এরপর এসব কিছুকে সূর্যালোকে রাখি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাব হাইড্রিলা উদ্বিদগুলোর কাণ্ডের প্রান্ত দিয়ে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয়ে টেস্টচিউবে জমা হচ্ছে এবং টেস্টচিউবের পানি নিচে নেমে যাচ্ছে। টেস্টচিউবটা প্রায় সম্পূর্ণটা গ্যাসে পূর্ণ হলে, দিয়াশলাইয়ের একটা নিবন্ধন কাঠি টেস্টচিউবের মুখে প্রবেশ করালে, নিবন্ধন কাঠিটি দপ করে জুলে উঠবে।

দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা কেন দপ করে জুলে উঠল?

এতে কী প্রমাণিত হয়?



চিত্র ৫.১ : সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা

পাঠ- ৭ : জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমেই সূর্যালোক ও জীবন এর মধ্যে সেতুবন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

খাদ্য উৎপাদন :

- (১) জীবজগতের জন্য প্রাথমিক খাদ্য শর্করা, একমাত্র সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।
- (২) প্রাণী হোক আর উদ্বিদ হোক জীবের কর্মচালগ্নের মূলে আছে খাদ্য। কারণ খাদ্যের সাথে শ্বসনের নিবিড় সম্পর্ক। শ্বসনের ফলে শক্তি নির্গত হয়। তাই তাপ শক্তি সরবরাহকারী শ্বসনপ্রক্রিয়াটির উপর উদ্বিদ ও প্রাণী একান্তভাবে নির্ভরশীল।

পরিবেশে গ্যাস বিনিময় :

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। ফলে প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকারক কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয় এবং শোষণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে সরবরাহ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে।

জীবাশ্ম জ্বালানি

কলকারখানা বা যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানি খনিজ তেল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি সম্পদ মূলত উদ্ভিদ হতেই আসে। এগুলোর মধ্যে নিহিত শক্তি এসেছে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্য থেকে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে জীবনের অন্তিম সম্পূর্ণ নির্ভর করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হলে মানবসভ্যতা নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। সে কারণে আমাদের উদ্ভিদ রক্ষায় আরও সচেতন হতে হবে।

এ অধ্যায়ে যা শিখলাম :

১. সালোকসংশ্লেষণে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড অক্সিজেন উৎপন্ন করে।
 ২. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের বায়ু পরিশোধিত হয়।
- নতুন শব্দ : সালোকসংশ্লেষণ, শর্করা খাদ্য, স্বতোজী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়?

ক. শর্করা	খ. আমিষ
গ. স্নেহ	ঘ. ভিটামিন
২. সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হলো-

i. পানি	ii. আলো
iii. অক্সিজেন	

 নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিকালে কনক মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। কিন্তু মাঠের মাঝে ঘাসের উপর একটি ইট পড়ে থাকতে দেখে। তখন সে ঘাসের উপর থেকে ইটটি সরিয়ে ফেলে এবং দেখে যে সব ঘাসগুলো সাদা হয়ে গেছে। অথচ পাশের ঘাসগুলো সবুজই রয়ে গেছে।

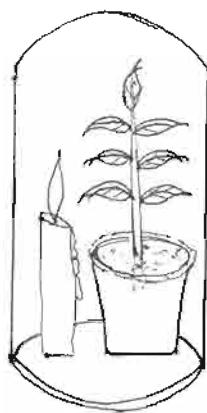
৩. পাশের ঘাসগুলো সবুজ থাকার জন্য নিচের কোনটি সরাসরি জড়িত?

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ক. পানি | খ. অক্সিজেন |
| গ. সূর্যের আলো | ঘ. কার্বন ডাই-অক্সাইড |
৪. কোন প্রক্রিয়া বিস্তৃত হওয়ার কারণে ঘাসগুলো সাদা হলো?

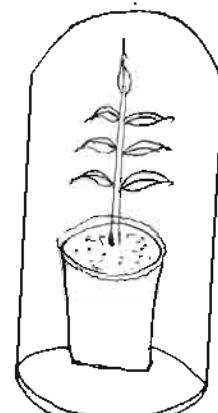
ক. ব্যাপন	খ. অভিস্রবণ
গ. শ্বসন	ঘ. সালোকসংশ্লেষণ

সূজনশীল ঘণ্টা :

১.



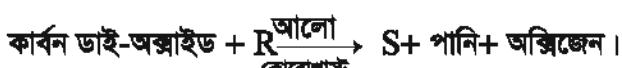
P



Q

- ক. সালোকসংপ্রেষণ কাকে বলে ?
 খ. সালোকসংপ্রেষণ প্রধানত উদ্ভিদের পাতায় সংযুক্ত হয় কেন ?
 গ. P বেলজারে মোমবাতিটি ছলে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর .
 ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায় Q বেলজারের গাছটি বেঁচে থাকবে কী ? উভয়ের পক্ষে ঝুঁকি দাও .

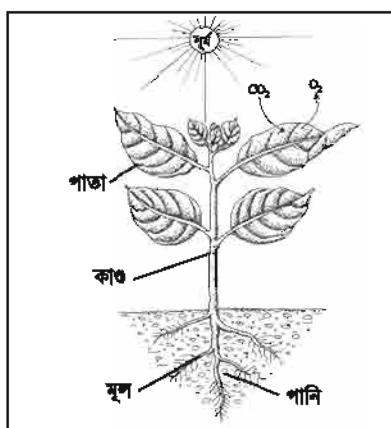
২.



- ক. পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস কী ?
 খ. রাতে সালোকসংপ্রেষণ হয় না কেন ?
 গ. উকীগকে উল্লিখিত বিক্রিয়ায় কীভাবে S যোগটি তৈরি হয় ? ব্যাখ্যা কর .
 ঘ. জীবজগতে উল্লিখিত বিক্রিয়ার উরত্ব বিশ্লেষণ কর .

খোজেষ্ট কাজ অনুসন্ধান

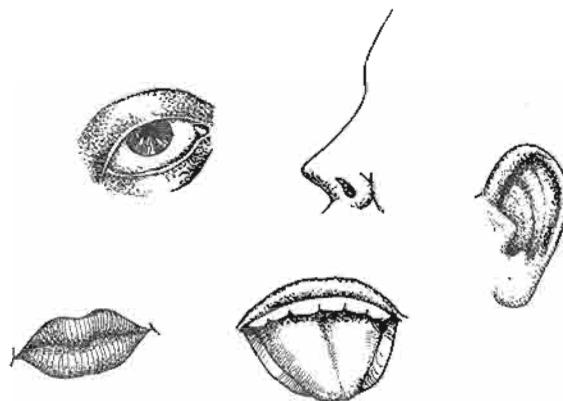
নিচের চিত্রটি থেকে ভূমি কী বুবলে ? খাতায় লিখ এবং শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর .



ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবেদী অঙ্গ

আমাদের দেহ একটি আজব যন্ত্র। যন্ত্রটির গড়ন এমন নিখুঁত যে এর কথা ভাবতেই অবাক লাগে। যন্ত্রের প্রতিটি অংশ মাপে মাপে বানানো। একটুও কম-বেশি নেই। আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ করে চলে। কাউকে কিছু বলতে হয় না। কার কী কাজ সে আপনিই বুঝে নিচ্ছে। আমাদের কিছু বুরার আগেই ঘটনা ঘটে যায়। যেমন- চোখের দিকে সাঁই করে একটি মাছি উড়ে এল ওমনি চোখের পাতা গেল বৃক্ষ হয়ে। অসাবধানে গরম চুলায় হাত পড়ল, তুমি হাত সরিয়ে নেবে। পারে কাঁটা ফুটার সাথে সাথে ‘উঃ মাগো’ বলে কাতরাবে। সারা শরীর জেনে গেল কী একটা পায়ে বিধলো বলে। আমরা এগুলো অনুভব করতে পারি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এ অধ্যায়ে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আলোচনা করব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- সংবেদী অঙ্গসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সংবেদী অঙ্গের ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- সংবেদী অঙ্গের যন্ত্র সেওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সংবেদী অঙ্গের যন্ত্রের বিষয়ে নিজে সচেতন ও অন্যকে যন্ত্র সচেতন করব।

পাঠ ১-৩ : সংবেদী অঙ্গ

আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ও বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো। সবাই বলে ওর মাথা ভালো। মাথা ভালো মানে মগজ ভালো। আমাদের দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ককে আমরা মগজ বলে থাকি। আমাদের দেহের সব কাজই চলছে মস্তিষ্কের হস্তামে। মস্তিষ্ক থাকে মাথার খুলির মধ্যে। খুলির মাঝখানে বসেই আমাদের দেহের বাইরের ও ভিতরের কাজকর্ম চালায় কীভাবে? চোখ, কান, নাক, তৃক, জিহ্বা বাইরের সকল খবরা-খবর জেগাড় করে মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয়। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শনি, জিহ্বা দিয়ে আমরা খবারের স্বাদ প্রাপ্ত করি, তৃক দিয়ে গরম, ঠাণ্ডা, তাপ, চাপ অনুভব করি। এগুলো সংবেদী অঙ্গ। এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরা-খবর। যেমন : তুমি রাত্তা পার হবে, হঠাত করে গাঢ়ি তোমার সামনে এসে পড়ল। তোমার চক্ষু তখনই জানিয়ে দেবে মস্তিষ্ককে। মস্তিষ্ক তখন তোমার মাস্সপেশীদের বলবে দাঁড়িয়ে যাও, এখন রাত্তা পারাপারের দরকার নেই। অমনি তোমার পা দুটো দাঁড়িয়ে থাবে।

চোখ :

আমরা চোখ বা অক্ষি দিয়ে পৃথিবীর সকল জিনিস দেখতে পাই। চোখ কীভাবে গঠিত? মাথার সামনে দুটো অক্ষি কোটরের মধ্যে এক জোড়া চোখ থাকে। ছয়টি পেশির সাহায্যে প্রতিটি চোখ অক্ষি কোটরে আটকানো থাকে। এই পেশিগুলোর সাহায্যে অক্ষিগোলক নড়াচড়া করানো যায়। আমরা যাকে অঞ্চল বলি তা হলো চোখের পানি। এ অঞ্চল আসে কোথা থেকে? অঞ্চলগুলি থেকে নিঃসৃত তরল যা চোখের পানি বা অঞ্চল নামে পরিচিত। অঞ্চল সবসময় চোখকে ভেজা রাখে, বাইরের ধূলাবালি ও জীবাণু পড়লে তা ধূয়ে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। চোখ কিন্তু আসলে চামড়া বা ত্বকেরই অংশ। চোখের ত্বক স্বচ্ছ আর পেছনে অংশ কালো। তার ফলে আমাদের চোখ হয়েছে ছেট ক্যামেরার মতো। চোখের বিভিন্ন অংশ ও কাজগুলো নিম্নরূপ-

(১) চোখের পাতা : চোখের বাইরের আবরণ। চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এটা বন্ধ করে চোখকে ধূলাবালি থেকে রক্ষা করে।

(২) কনজাংকটিভা : চোখের পাতা খুললেই চোখের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই, সে অংশটুকু একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে তার নাম কনজাংকটিভা।

(৩) অক্ষি গোলক : এটি গোলাকার বলের মতো অঙ্গ। গোলকটি তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।

ক) স্কেরা : অক্ষি গোলকের বাইরের সাদা, শক্ত ও পাতলা স্তরটি হলো স্কেরা। এটি চোখের আকৃতি রক্ষা করে। এর ভিতর দিয়ে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না।

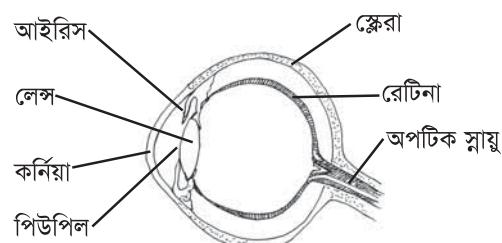
কর্নিয়া : স্কেরার সামনের চকচকে অংশটি হলো কর্নিয়া। এ অংশটি একেবারেই স্বচ্ছ। এর ভিতর দিয়েই আলো চোখের ভিতর ঢোকে।

খ) কোরয়েড : স্কেরা স্তরের নিচের স্তরটি কোরয়েড। এটা একটা ঘন রঞ্জিত পদার্থের স্তর। এখানে বহু রক্তনালি প্রবেশ করে।

আইরিশ : কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার পর্দা থাকে। একে আইরিশ বলে। আইরিশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে, যাকে পিউপিল বলে। আইরিশ পেশি দিয়ে তৈরি। একে আমরা সাধারণত চোখের মণি বলে থাকি। আইরিশের পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। আইরিশের পেশি সংকোচন প্রসারণের ফলে পিউপিল ছেট বড় হতে পারে। এর ফলে আলোকরশ্মি রেটিনায় প্রবেশ করতে পারে।

পারে।

লেন্স : পিউপিলের পেছনে একটি দ্বি-উত্তল লেন্স থাকে। লেন্সটির মাঝখানের দুই দিক উঁচু আর আগাটা সরু। লেন্সটি এক বিশেষ ধরনের সিলিয়ারি পেশি দ্বারা আটকানো থাকে। এ পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। এদের সংকোচন প্রসারণ দরকার মতো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে।



চিত্র : ৬.১ চোখের অস্তঃগঠন

গ) রেটিনা : রেটিনা অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভিতরের স্তর। এটি একটি আলোক সংবেদী স্তর। এখানে রাড ও কোন নামে দুই ধরনের কোষ রয়েছে।

চোখের লেন্সটি চক্ষু গোলককে সামনে ও পেছনে দুইটি অংশে বিভক্ত করে। এই অংশগুলোকে প্রকোষ্ঠ বলে। সামনের প্রকোষ্ঠে জলীয় এবং পেছনের প্রকোষ্ঠে এক বিশেষ ধরনের জেলীর মতো তরল পদার্থ থাকে, যা চক্ষুগোলকে আলোকরণ্ড্রি প্রবেশ, পুষ্টি সরবরাহ এবং চক্ষুগোলকের আকার বজায় রাখতে সহায়তা করে।

চোখের যত্ন : চোখ একটি কোমল অঙ্গ, খুব যত্নে রাখতে হবে। ঠিকমতো যত্ন না নিলে চোখে নানা অসুখ হতে পারে। যেভাবে চোখের যত্ন নেওয়া যায় তাহলো-

- ঘুম থেকে উঠে ও বাইরের থেকে আসার পর অবশ্যই পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে চোখ দুইটি পরিষ্কার করা।
- চোখ মোছার জন্য পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা।
- নিয়মিত সবুজ শাকসবজি ও রঙিন ফলমূল খাওয়া। এগুলোতে ভিটামিন এ থাকে। এগুলো চোখের জন্য খুবই ভালো। এগুলো থেলে রাতকানা হওয়া এড়ানো যায়।

কাজ : মডেল বা চার্টের সাহায্যে চোখের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতায় মানুষের চোখের একটি চিত্রঝঁকে এর অংশগুলোর নাম লিখ।

নতুন শব্দ : সংবেদী অঙ্গ, রেটিনা, লেপ, অফিগোলক, পিউপিল, আইরিশ, স্কেরা, কনজাংটিভা।

পাঠ ৪-৫ : কান বা কর্ণ

আমরা কী দিয়ে শুনি? আমরা কান দিয়ে শুনি। কান না থাকলে আমরা শুনতে পেতাম না। কথাও বলতে পারতাম না, কারণ কথা বলাটা তো শিখতে হয় শুনে শুনে।

আমাদের মাথার দুই পাশে দুটো কান বা কর্ণ আছে। কর্ণ বা কান আমাদের শুনতে ও দেহের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে। আমাদের কান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১. বহিঃকর্ণ, ২. মধ্যকর্ণ ও ৩. অন্তঃকর্ণ।

১। বহিঃকর্ণ : পিনা, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে বহিঃকর্ণ গঠিত।

(ক) **পিনা :** এটি কানের বাইরের অংশ। মাংস ও কোমলস্থি দিয়ে গঠিত। শব্দ কর্ণকুহরে পাঠানো এর প্রধান কাজ।

(খ) **কর্ণকুহর :** পিনা একটি নালির সাথে যুক্ত। এ নালিটিকে কর্ণকুহর বলে।

(গ) **কর্ণপটহ :** কর্ণকুহর শেষ হয়েছে একটা পর্দায়। এ পর্দাটির নাম কর্ণপটহ। কর্ণপটহ বহিঃকর্ণের শেষ অংশ।



চিত্র : ৬.২ কানের অন্তঃগঠন

২। মধ্যকর্ণ : বহিঃকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মাঝখানে মধ্যকর্ণ অবস্থিত। এটা একটা বায়ুপূর্ণ থলি যার মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড় বা অঙ্গি রয়েছে। অঙ্গিসমূহের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ বা চেউ অন্তঃকর্ণে পৌছায়। কানের সাথে গলার সংযোগের জন্য একটি নল আছে। এ নলটির কাজ হলো কর্ণপটহের বাইরের ও ভেতরের বায়ুর চাপ সমান রাখা।

৩। অন্তঃকর্ণ : এটি অডিটরি ক্যাপসুল অঙ্গির মধ্যে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

(ক) **ইউট্রিকুলাস :** অন্তঃকর্ণের এ প্রকোষ্ঠটি তিনটি অর্ধাবৃত্তাকার নালি দিয়ে গঠিত। এদের ভিতরে আছে খুব সূক্ষ্ম লোমের মতো স্নায় ও রস। নালির ভিতরের এ রস যখন নড়ে বা আন্দোলিত হয়, তখনই স্নায়গুলো উদ্বৃষ্টি হয়। আর তখনই সে উদ্বৃষ্টিপনা মন্তিক্ষে পৌছায়।

(খ) **স্যাকুলাস :** অন্তঃকর্ণের এই প্রকোষ্ঠের চেহারা অনেকটা শামুকের মতো পঁয়াচানো নালিকার মতো। একে ককলিয়া বলে। ককলিয়ার ভেতরে শ্রবণ সংবেদী কোষ থাকে। পঁয়াচানো নালিকা এক ধরনের রসে পূর্ণ থাকে।

কানের যত্ন : কান আমাদের শ্রবণইন্দ্রিয়। কানের সমস্যার কারণে আমরা বধির হয়ে যেতে পারি। কানের যত্ন নেওয়ার জন্য যা করতে হবে, তাহলো-

- নিয়মিত কান পরিষ্কার করা।
- গোসলের সময় কানে যেন পানি না ঢোকে সেদিকে সতর্ক থাকা।
- কানে বাইরের কোনো বস্তু বা পোকামাকড় ঢুকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- উচ্চ শব্দে গান না শুনা।

পাঠ- ৬

কাজ : মডেল বা চার্টের সাহায্যে কানের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতায় মানুষের কানের একটি চিত্র এঁকে এর অংশগুলোর নাম লিখ। বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ কর।

নতুন শব্দ : কর্ণপটহ, মধ্যকর্ণ, অন্তঃকর্ণ, অর্ধবৃত্তকার নালি, ককলিয়া।

পাঠ ৭ নাক :

নাক : আমরা নাক দিয়ে কোনটা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ তা অনুভব করতে পারি। নাক দিয়ে আমরা শ্বাস নেই। ফুলের সুগন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করি আর পচা, ময়লা ও আবর্জনার গন্ধ পেলে নাকে কাপড় দেই। মুখ গহ্বরের উপরে নাক অবস্থিত। এর দুটো অংশ আছে। (১) নাসারঞ্জ ও (২) নাসাপথ।

(১) **নাসারঞ্জ :** নাকের যে ছিদ্র দিয়ে বাতাস দেহের ভেতর ঢোকে তাকে নাসারঞ্জ বলে।

(২) নাসাপথ : এটা নাসারক্ষ থেকে গলার পেছন ভাগ বা গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গহ্বর। এ গহ্বরটি ত্রিকোণাকার। পাতলা প্রাচীর দিয়ে গহ্বরটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর সামনের ভাগ লোম দ্বারা আবৃত থাকে ও পেছনের দিকটা পাতলা আবরণী বিল্লি আবৃত থাকে। এই বিল্লিকে আগ বিল্লি বলা হয়। এতে থাকে সূক্ষ্ম রক্ত নালিকা যা অসংখ্য আগকোষের সাথে সংযোগ রক্ষা করে।

নাকের যত্ন : নাক দিয়ে আমরা আগ নিই। শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই, নাকের মধ্যে শ্লেষা বিল্লির আবরণ থাকে। শিশুদের নাকের শ্লেষার সাথে ধুলাবালি জমে, এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

জিহ্বা : রাকিবের খুব মিষ্টি পছন্দ। মিষ্টি দেখলে ওর জিভে পানি আসে। জিভ বা জিহ্বা দিয়ে আমরা খাদ্যবস্তুর টক, ঝাল, মিষ্টি, তিতা স্বাদ গ্রহণ করে থাকি। এটা আমাদের স্বাদইন্দ্রিয়। মুখ গহ্বরে অবস্থিত লম্বা পেশিরভূল অঙ্গটি হল জিহ্বা। জিহ্বার উপরে একটি আস্তরণ আছে, এতে বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণের জন্য স্বাদ কোরক থাকে। জিহ্বার সামনে, পেছনে, পাশে স্বাদ গ্রহণের জন্য বিশেষ স্বাদকোরক থাকায় আমরা জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে মিষ্টি ও নোনতা, পাশের অংশ দিয়ে লবণ ও টক স্বাদ অনুভব করে থাকি। জিহ্বার মাঝাখানে কোনো স্বাদকোরক থাকে না। স্বাদকোরক না থাকায় আমরা জিহ্বার মাঝাখানাটায় কোনো বিশেষ স্বাদ পাই না। এ ছাড়া জিহ্বার একেবারে পেছনের অংশে বড় আকারের কোরকগুলো তিতা বা তিক্ত স্বাদ অনুভব করতে সহায়তা করে।

জিহ্বার কাজ :

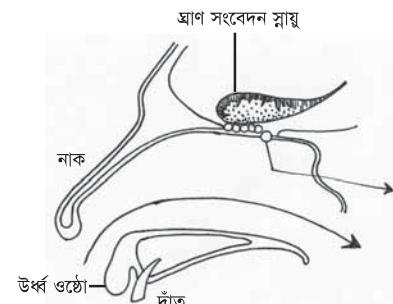
- খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা।
- খাবার গিলতে সাহায্য করা।
- খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে দাঁতের নিকট পৌঁছে দেয়। ফলে খাদ্যবস্তু চিবানো সহজতর হয়।
- খাদ্যবস্তুকে লালার সাথে মিশ্রিত করতে সাহায্য করে।
- জিহ্বা আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে।

জিহ্বার যত্ন :

খাদ্য পরিপাকের জন্য জিহ্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বার যত্ন নিতে হলে যা করতে হবে তা হলো-

- দাঁত ব্রাশ করার সময় নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা।
- শিশুদের নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। তা না হলে জিহ্বায় ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে।
- অনেক রোগের কারণে জিহ্বার উপর সাদা বা হলদে পর্দা পড়ে। জ্বর হলে সাধারণত এটা হয়। এ সময় পানিতে লবণ গুলে কুলকুচি করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- শিশুদের জিহ্বা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে জিহ্বার উপর দইয়ের মতো দেখতে ছেট ছেট দাগ দেখা দেয়। এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে হয়।
- মুখ ও জিহ্বায় ঘা হলে অতি তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

নতুন শব্দ : স্বাদ কোরক, নাসাপথ, গলবিল।



চিত্র : ৬.৩ নাকের অঙ্গসংগঠন



চিত্র : ৬.৪ জিহ্বার গঠন ও স্বাদ অঞ্চল

পাঠ-৮ : ত্বক ও ত্বকের যত্ন

আমরা শরীরের উপর দিয়ে পিপড়ে হেঁটে গেলে টের পাই। কোনো জিনিস গরম না ঠাণ্ডা তা বুঝতে পারি। কেউ তোমাকে ছুলে তাও বুঝতে পার। এগুলো কে করে? কীভাবে ঘটে। চর্ম বা ত্বকের সাহায্যে এগুলো ঘটে।

ত্বক বা চামড়া :

যেসব অঙ্গ দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত, সেগুলো যাতে রোগজীবাণু বা বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য সমষ্ট দেহ চামড়া বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে। এ ত্বকই হচ্ছে আমাদের দেহের আবরণ। ত্বকের দুটি ত্ত্বর আছে, একটি উপচর্ম বা বহিত্বক এবং অন্যটি অস্তঃচর্ম বা অস্তঃত্বক।

উপচর্ম :

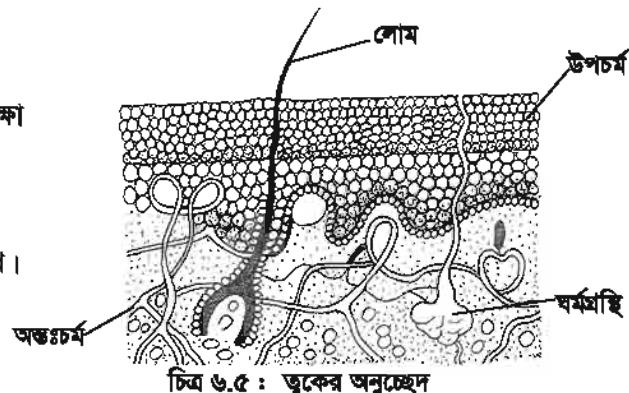
উপচর্ম হচ্ছে ত্বকের বাইরের আবরণ। হাতের তালু ও পায়ের তালুর চামড়া বা ত্বক খুব পুরু আবার ঠোঁটের চামড়া বা ত্বক পাতলা। এ উপচর্ম থেকেই লোম, চুল ও নখের উৎপন্নি হয়। উপচর্মে লোমকূপও রয়েছে।

অস্তঃচর্ম বা অস্তঃত্বক :

অস্তঃত্বকে রয়েছে রক্তনালি ও স্নায়ু। এ ছাড়াও রয়েছে লোমের মূল, ঘর্মপ্রস্তু, তেলপ্রস্তু, শেদগ্রস্তি ইত্যাদি। লোমহীন হানে অর্ধাং করতল ও পদতলে বেদনশুষ্কির সংখ্যা বেশি থাকে।

ত্বকের সাধারণ কাজ :

- দেহের ভিতরের কোমল অংশকে বাইরের আঘাত, ঠাণ্ডা, গরম, রোদ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।
- দেহে রোগজীবাণু তুকতে বাধা দেয়।
- শাম বের করে দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা ও সুস্থ রাখে।
- দেহের ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়।
- সূর্য রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে।



ত্বকের যত্ন :

- ত্বক আমাদের দেহের বাইরের আবরণ তৈরি করে। ত্বকের যত্ন নিতে হলে বা করা দরকার, তা হলো-
- নিয়মিত গোসল করা। নিয়মিত গোসল করলে ত্বক বা চামড়ার সংক্রমণ, খুশকি, চুলকানি ইত্যাদি সমস্যা এড়ানো যায়।
 - অন্যের ব্যবহার করা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত নয়। দুই-একদিন পরপর নিজের ব্যবহৃত তোয়ালে বা গামছা গরম পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা।
 - ত্বকে কোনো রকম রোগ (যেমন- খোসপাঁচড়া, দাদ) দেখা দিলে ডাক্তারের পরমর্শ নিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো মলম ব্যবহার করা যাবে না।

কাজ : মডেল বা চার্ট দেখে ত্বকের চিত্র অংকন কর এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

এ অধ্যায় শেষে আমরা যা জানলাম-

- চোখের লেন্স দিউভল
- সিলিয়ারি পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে লেন্সকে বাঁকাতে, গোল ও চ্যাপ্টা করতে পারে।
- আইরিশ পেশি সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে পিউপিল ছোট বড় করা যায়।

অনুশীলনী

শূন্ঘান পূর্ণ কর :

1. ----- ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে।
2. ----- মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র অঙ্গ থাকে।
3. ----- বহিঃকর্ণের শেষ অংশ।
4. জিহ্বায় স্বাদ ----- থাকে।
5. আগকোষগুলো বিশেষ স্নায়ুর সাহায্যে ----- সাথে সংযোগ রক্ষা করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. আমাদের দেহের চালক কোনটি?

ক. হাত	খ. পা
গ. চোখ	ঘ. মন্তিক

২. স্বাম তৈরি হয় কোথায়?

ক. উপচর্মে	খ. অন্তঃগৃহকে
গ. ঘর্মহান্তিতে	ঘ. লোমকূপে

- নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বার বছর বয়সী একজন ছেলে অনিয়মিতভাবে গোসল করে, এমনকি গোসলের পর নির্দিষ্ট তোয়ালে ব্যবহার করে না।
সম্প্রতি তার মাথায় খুশকির মাত্রা খুব বেড়েছে। এ ছাড়া তার গায়ে খোসপাঁচড়া হওয়ায় সে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে
মলম কিনে লাগায়।

৩. ছেলেটির মাথায় কীসের সমস্যা হয়েছে?

ক. তুকের	খ. চুলের
গ. গ্রস্তির	ঘ. মন্তিকের

৪. খোসপাঁচড়া যাতে না হয় সে জন্য ছেলেটিকে-

i. নিয়মিত গোসল করতে হবে	ii. পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে
iii. যেকোনো মলম লাগাতে হবে	

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

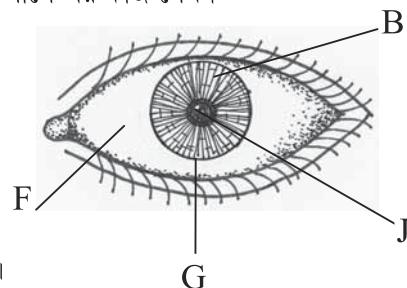
১. জিহ্বাকে স্বাদ ইন্দ্রিয় বলা হয় কেন?
২. মধ্যকর্ণ কীভাবে শ্রবণে সহায়তা করে।
৩. চোখের রেটিনার কাজ কী?
৪. চোখের লেপ নষ্ট হয়ে গেলে কী ঘটবে?
৫. ত্বকের কাজ কী?

নিজেরা কর

১. তোমার জিহ্বা যে একটি স্বাদ ইন্দ্রিয় তা তুমি কীভাবে নির্ণয় করবে বর্ণনা কর।
২. চোখের একটি চিত্র এঁকে লেপ ও রেটিনা চিহ্নিত কর এবং চিত্রের পাশে এর কাজ লেখ।

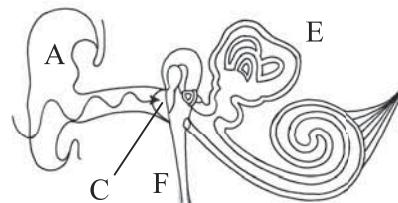
সূজনশীল প্রশ্ন

১. পাশের চিত্র দেখে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
 - ক. F চিহ্নিত অংশে নাম লিখ।
 - খ. চোখের G অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কী ঘটবে?
 - গ. B অংশের কাজ ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. J অংশ কীভাবে আমাদের দেখতে সাহায্য করে আলোচনা কর।



২. পাশের চিত্র দেখে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

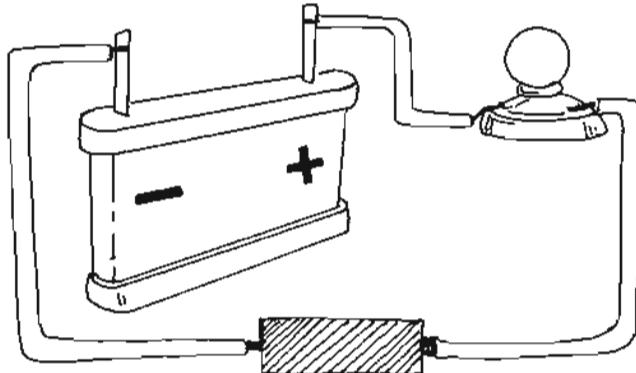
- ক. সংবেদী অঙ্গ কাকে বলে?
- খ. A চিহ্নিত অংশ না থাকলে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।
- গ. E চিহ্নিত অংশের কাজ উল্লেখ কর।
- ঘ. E ও F চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।



সপ্তম অধ্যায়

পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব

লোহা, তামা, রবার, কাঠ, ইত্যাদি হাজারো রকমের পদার্থ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে শুভঙ্গোত্তভাবে জড়িত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন বলেই এদের একেকটি একেক কাজে ব্যবহৃত হয়।



এই অধ্যায় থেকে আমরা

- পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পদার্থের প্রক্রিয়াসমূহ করতে পারব।
- তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতু এবং অধাতুর কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করব এবং এদের ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে ধাতু এবং অধাতুর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নির্ণয় করতে পারব।
- গলনাক ও স্কুটনাক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে পদার্থের গলনাক এবং স্কুটনাক নির্ণয় করতে পারব।
- ধামা ঘড়ি, থার্মোমিটার সুনিপুণভাবে ব্যবহারে সক্ষম হব।
- শীতলীকরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আঘাতে ধাতু এবং অধাতুর পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালে পর্যাঙ্ক নিরাগভাবুলক ব্যবহাৰ গ্ৰহণে উদ্দেশ্যগী হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ ১-৩ : পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস

কোনো কিছু করতে গেলেই আমাদের নানারকম জিনিস ব্যবহার করতে হয়। সকাল বেলা ঘূম থেকে উঠেই আমাদের হাত মুখ খোয়ার জন্য পানি থেকে শুরু করে নানারকম খাদ্যসামগ্রী, ইঁড়িগাতিল, কাপড়চোপড়, খেলনা, পাথর, সাইকেল, ফুটবল, মার্বেল, বইপত্রসহ হাজারো রকমের জিনিস আমরা বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছি। এদের মধ্যে কোনোটি নরম, কোনোটি শক্ত, কোনোটি দেখতে চকচকে, কোনোটি গোল, কোনোটি চেপ্টা ইত্যাদি। কিন্তু এরা সবাই পদার্থ। এরা সবাই জায়গা দখল করে এবং প্রত্যেকেই ওজন আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, যা জায়গা দখল করে ও যার ওজন আছে তাকেই পদার্থ বলে।

পৃথিবীতে হাজারো রকমের পদার্থ রয়েছে এবং তাদেরকে নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এর একটি শ্রেণিবিন্যাস হলো পদার্থের অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। এক টুকরো বরফ নিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিলে কি ঘটে? এটি পানিতে পরিণত হয়। আবার ঐ পানিকে তাপ দিলে তা বাস্পে পরিণত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পানি তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে। আর তাহলো বরফ, পানি আর বাস্প। যখন বরফ আকারে থাকে তখন এটিকে বলা হয় কঠিন অবস্থা। পানির আকারে থাকলে তখন এটিকে বলা হয় তরল অবস্থা আর বাস্প আকারে থাকলে এটি হলো গ্যাসীয় অবস্থা। পানির ন্যায় প্রতিটিই পদার্থই এই তিন অবস্থাই থাকতে পারে। তাই অবস্থাভেদে পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।



এখানে প্রশ্ন হলো কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি পদার্থ কঠিন, তরল, অথবা বায়বীয় হবে?

কঠিন পদার্থের আকার আছে। কোনো বস্তু যতটুকু জায়গা দখল করে সেটিই ঐ বস্তুর আয়তন। সকল কঠিন বস্তুই জায়গা দখল করে, তাই সকল বস্তুরই আয়তন আছে। কঠিন পদার্থের আয়তন ও আকার সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এরা যথেষ্ট দৃঢ় অর্থাৎ এদের দৃঢ়তা আছে। তবে কিছু কিছু কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা কম (যেমন : সরিষার দানা, ভাত, কলা)।

এবার আমরা তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য জানব।

তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এটি যে পাত্রে রাখা হয় ঐ পাত্রের আকার ধারণ করে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কারণ কঠিন পদার্থের মতো এরাও জায়গা দখল করে। এদের আয়তনও পরিমাপ করা যায়। এই আয়তন কি পরিবর্তন হয়? না, পাত্রভেদে আকার পরিবর্তন হলেও আয়তন কিন্তু একই থাকে। যেহেতু তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই, আকার পরিবর্তনশীল, তাই বলা যায় যে এরা কঠিন পদার্থের মতো দৃঢ় নয়। অর্থাৎ তরল পদার্থের দৃঢ়তা নেই।

গ্যাসের বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য আমরা বাতাসের কথাই ধরি। বাতাসের মতো কোনো গ্যাসের আকার নেই। গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে কি? তোমরা দুটি সিলিঙ্গারের কথা চিন্তা কর যার একটি ছোট আর একটি বড়।

এখন যদি সম্পরিমাণ গ্যাস দুই সিলিন্ডারে রাখ তাহলে তা ছেট সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে যেমন সম্পূর্ণ সিলিন্ডার জুড়ে থাকবে, তেমনি একই পরিমাণ গ্যাস বড় সিলিন্ডারে রাখলেও তা সম্পূর্ণ সিলিন্ডার জুড়ে থাকবে। তাহলে বলা যায় যে, একই পরিমাণ গ্যাস ছেট পাত্রে রাখলে এর আয়তন কম হয় অথচ বড় পাত্রে রাখলে এর আয়তন বেশি হয়। অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয় ঐ পাত্রের আয়তনই গ্যাসের আয়তন। গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই।

এ ছাড়া পদার্থকে যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা যায় তা হলো ঘনত্ব, কাঠিন্য, নমনীয়তা তাপ পরিবাহিতা ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা।

কাজ : তোমার বাড়ি ও স্কুল থেকে নিচের জিনিসগুলো সংগ্রহ কর।

চক, পেনসিল, নোটবুক, রবার, ডাস্টার, হাতুড়ি, তারকাঁটা, সাবান, সাইকেলের চাকার স্পোক, ক্রিকেট ব্যাট, দিয়াশলাইয়ের বারঞ্জ, লবণ, এলুমিনিয়ামের থালাবাসন ও স্কুলের ঘট্টা ইত্যাদি। এদের কোনগুলো কাগজ, কাঠের ও ধাতুর তৈরি এবং কোনগুলো এদের কোনোটাই নয়। কোনটি চক্ চক্ করে এবং কোনটি করে না সে অনুযায়ী ভাগ কর। যেগুলো চক্ চক্ করে তা ধাতুর তৈরি।

কাঠিন্য ও নমনীয়তা

কোন পদার্থ নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা নমনীয়, কোনটা অনমনীয়। নিজেরা কাজটি করো। এদের সম্পর্কে জানো।

কাজ : একটি এলুমিনিয়ামের পাত্র। একখণ্ড রবার, একখণ্ড কাঠ, মোমবাতি, এক টুকরা পাথর ও একটি প্যারেক নাও। এগুলোতে একটি ধাতব চাবি দিয়ে দাগ কেটে দেখ। কোনোটাতে খুব সহজে দাগ কাটা যায়। কোনোটাতে দাগ কাটা কঠিন। দুই আঙুলের মাঝে নিয়ে এদের প্রত্যেককে চাপ দিয়ে দেখ। দেখবে কোনোটা নমনীয়, কোনোটা শক্ত ও অনমনীয়। এদের মধ্যে কোনোটা খসখসে, কোনোটা মসৃণ, কোনোটা ভঙ্গুর।

এবার নিজের মতো সারণি কর।

বস্তুর নাম	শক্ত	নরম	নমনীয়	অনমনীয়
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				

ঘনত্বের ভিত্তিতে পদার্থকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে দেখা গেছে ধাতুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা পদার্থের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ৪- ৬ : ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য

ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে পদাৰ্থকে দুই ভাগে ভাগ কৱা হয়েছে। একটি হলো ধাতু ও অন্যটি অধাতু। এখন আমোৱা ধাতু ও অধাতুৰ কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিই।

ধাতু : এলুমিনিয়ামের নানাকম পাত্ৰ, সোনাৰ গহনা, তামাৰ বৈদ্যুতিক তাৰ -এগুলোকে আমোৱা নানা কাজে ব্যবহাৰ কৱি। এ পদাৰ্থগুলো দেখতে কেমন? চকচকে। এটি হলো বেশিৱডাগ ধাতুৰ একটি সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে রান্নার কাজে আমোৱা এলুমিনিয়ামেৰ পাত্ৰ বা লোহাৰ কড়াই ব্যবহাৰ কৱি। কেন? কাৰণ এৱা চূলাৰ আঙুল থেকে তাপ পৱিবহন কৱে রান্নার মূল উপাদানে (যেমন-চাল বা মাছ) পৌছে দেয় ও উপাদানগুলো ঐ তাপে সিক্ক হয়ে যায়। অৰ্থাৎ ধাতুসমূহেৰ আৱেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এৱা তাপ পৱিবহন কৱে। তাই এদেৱ তাপ সুপৰিবাহী বলে।

আবাৰ বিদ্যুৎ পৱিবহনে তামাৰ তাৰ ব্যবহাৰ কৱাৰ কাৰণ কী? বিদ্যুৎ পৱিবহন কৱা অৰ্থাৎ ধাতুৰ পদাৰ্থসমূহ বিদ্যুৎ সুপৰিবাহী। এককথাৰ বলা যায়, ধাতু বা ধাতুৰ পদাৰ্থসমূহ সাধাৰণত দেখতে চকচকে, তাপ ও বিদ্যুৎ সুপৰিবাহী হয়।

অধাতু : তোমোৱা কি বলতে পাৱে নাইট্ৰোজেন, অক্সিজেন বা হাইড্ৰোজেন গ্যাস দেখতে কেমন? বলতে পাৱে না, কাৰণ ধাতুৰ মতো চকচকে বা এ জাতীয় চোখে পড়াৰ মতো বৈশিষ্ট্য এদেৱ নেই। আবাৰ এৱা ধাতুৰ ন্যায় তাপ ও বিদ্যুৎ পৱিবহনও কৱে না। তাই এদেৱকে তাপ ও বিদ্যুৎ কুপৰিবাহী বা অপৰিবাহী পদাৰ্থ বলা হয়।

কাজ : তোমোৱা ম্যাগনেসিয়াম রিবন, দস্তাৰ পাত্ৰ, প্লাস্টিক, কাঠেৰ ও স্টিলেৰ ক্ষেত্ৰে এক এক কৱে মোদে রাখ ও ভালোভাবে লক্ষ কৱি কোনটি চক চক কৱে ও কোনটি কৱে না এবং টেবিলে লিপিবদ্ধ কৱি।

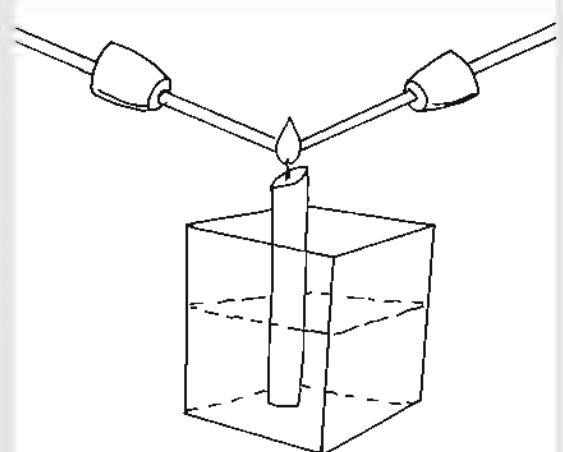
টেবিল-১ :

পদাৰ্থেৰ নাম	বৈশিষ্ট্য

কাজ : ধাতুৰ পদাৰ্থেৰ (তামা) তাপ পৱিবাহিতা পৰ্যবেক্ষণ।

ঘোষণাৰ উপকৰণ : তামাৰ মোটা তাৰ (২০ সেন্টিমিটাৰ), দুটি কৰ্ক বা শোলাৰ টুকুৱা, দিমাশপলাই, মোমবাতি বা স্পিন্ডেল ল্যাম্প।

প্ৰক্ৰিয়া : কৰ্কেৰ মধ্য দিয়ে তামাৰ তাৰ সতৰ্কতাৰ সাথে এমনভাৱে প্ৰবেশ কৱাও যাতে কক্ষি তাৱেৰ মাঝে বৰাবৰ থাকে। মোমবাতিটি ছালাও। তামাৰ তাৱেৰ এক প্ৰান্ত ধৰে অপৰ প্ৰান্ত মোমবাতিটিৰ শিখাৰ উপৰ ধৰ। এভাৱে যতক্ষণ পৰ্যন্ত হাতে গৱাম অনুভৱ না কৱি ততক্ষণ পৰ্যন্ত ধৰে রাখ।



চিত্ৰ ৭.১ : ধাতুৰ পদাৰ্থেৰ তাপ পৱিবাহিতা

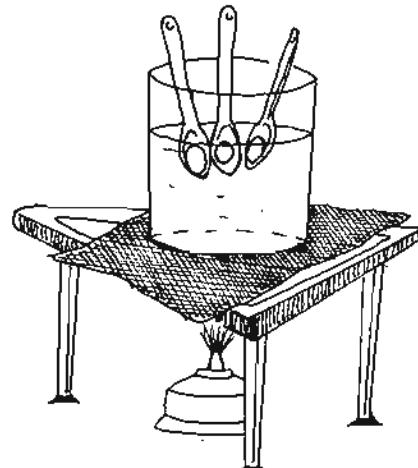
এখানে কর্ক ব্যবহারের কারণ কী? মোমবাতির শিখা থেকে সরাসরি তাপ যেন হাতে না লাগতে পারে সে জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তোমরা বল তাহলে তামার তারের যে প্রান্ত হাতে ধরে রেখেছ সেখানে গরম অনুভব করছ কেন? মোমবাতির শিখা থেকে তারের এক প্রান্ত তাপ ঘৃণ করছে এবং তামা তাপ সুপরিবাহী হওয়ায় তা তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অপর প্রান্তে পৌছেছে। যদি তা না হতো তাহলে তোমরা হাতে গরম অনুভব করতে না। তাহলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে তামা তাপ সুপরিবাহী। তামার মতো সকল ধাতুই তাপ পরিবহন করে।

আর সেজন্য যে সমস্ত কাজে তাপ পরিবহন প্রয়োজন হয় (যেমন- রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, সৌর প্যানেল ইত্যাদি) সে সমস্ত ক্ষেত্রে ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তাই এদের সম্ব্যবহার করা বা অপচয় রোধ করা আমাদের নেতৃত্ব দায়িত্ব।

কাজ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের চামচ, ১টি প্লাস্টিকের চামচ, ১টি এলুমিনিয়ামের চামচ, ৩টি ১ টাকার মুদ্রা, ১টি ৬০০ মিলিলিটারের বিকার, ৩০০ মিলিলিটার পানি ও স্পিরিট ল্যাম্প, মোম, দিয়াশলাই, ধাতা ঘড়ি।

পদ্ধতি : দিয়াশলাই জ্বালিয়ে মোমে অঙ্গ তাপ দিয়ে কিছুটা নরম হলো কিছু মোম প্রতিটি চামচের হাতলের উপর চাপ দিয়ে বসাও। এবার মুদ্রাগুলি মোমের উপর রেখে এমনভাবে চাপ দাও যাতে মুদ্রাগুলো চামচের সাথে সেগে থাকে। বিকারে ৩০০ মিলিলিটারের ঘতো পানি নাও। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসাও। এখন চামচ ডিনটিকে সূতা দিয়ে বেঁধে বিকারে এমনভাবে ঢুবাও যাতে মুদ্রাগুলো বিকারের উপরিভাগের বাইরে থাকে। এবার চূলার আঙুল জ্বালিয়ে বিকারে তাপ দিতে থাক। মুদ্রাগুলোর দিকে চোখ রাখ। ধাতা ঘড়ির সাহায্যে কোন মুদ্রাটি চামচ থেকে আলাদা হতে কত সময় সাগে তা নির্ণয় কর।



চিত্র ৭.২ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

কোন চামচ থেকে সবার আগে কোনটি থেকে সবার পরে মুদ্রা আলাদা হলো? আলাদাই বা হলো কেন? নিঃসন্দেহে এলুমিনিয়ামের চামচ থেকে সবার আগে মুদ্রা আলাদা হলো, কারণ এলুমিনিয়াম তাপ সুপরিবাহী বলে বিকারের গরম পানি থেকে তাপ তুলনামূলকভাবে দ্রুত পরিবাহিত করে মোমে পৌছায়। ফলে মোম গলে যায় এবং মুদ্রা মোম থেকে সবার আগে আলাদা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্লাস্টিকের তাপ পরিবাহিত সবচেয়ে কম বলে প্লাস্টিকের চামচের গরম প্রাঙ্গ থেকে তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে তাপ পরিবাহিত হয়ে ঠাণ্ডা প্রান্তে অর্ধাং মোমের দিকে যায়। ফলে মোম গলতে সময় বেশি লাগে। আর সেকারণেই সবার পরে মোম থেকে মুদ্রা আলাদা হয়। আবার কাঠের তাপ পরিবাহিতা এলুমিনিয়ামের চেয়ে কম কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি বলে প্লাস্টিকের চেয়ে ধীর গতিতে মোমে পৌছায়। ফলে কাঠের চামচ থেকে মুদ্রা আলাদা হতে এলুমিনিয়ামের চেয়ে বেশি কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে কম সময় লাগে।

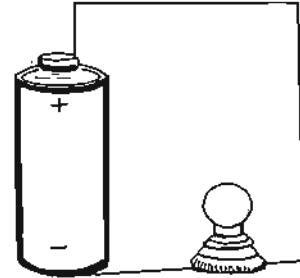
পাঠ ৭-৮ : ধাতু ও অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

এর আগে তোমরা জেনেছ যে ধাতুসমূহ সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা ক্রপরিবাহী হয়। এখন তোমরা নিজেরাই দেখবে কীভাবে ধাতুসমূহ বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে।

কাজ : ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ব্যাটারি, একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব, ২টি বৈদ্যুতিক ভার, স্টিলের চামচ, এলুমিনিয়ামের টুকরা, রবার, কাঠ, প্লাস্টিকের চামচ।

পদ্ধতি : ব্যাটারিটি নাও ও দেখ এক পাত্তে ঘোগ চিহ্ন (+) অপর পাত্তে বিরোগ চিহ্ন (-) দেওয়া আছে। ১টি তামার তার ব্যাটারির একটি এক পাত্তে এবং অপরটি অপর পাত্তে আটকিয়ে দাও। (চিত্রের মতো) তোমাদের যেকোন একজন বৈদ্যুতিক বাল্বটি নাও। শক্ত কর বাল্বের যে প্রাণ্ত আমরা সকেটে প্রবেশ করাই সে পাত্তে দুই পাশে একটু উঁচু করে বসানো দুটি ধাতব সংযোগ বিন্দু বা মোটা তারের মতো সংযোগ বিন্দু আছে। এবার দুটি তারের একটির খোলা প্রাণ্ত এই দুটি বিন্দুর একটিতে আর অপর তারটির খোলা প্রাণ্ত অপর সংযোগ বিন্দুতে আটকাও।



চিত্র ৭.৩ : বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

কী দেখতে পাচ্ছ তোমরা? বাল্বটি ঝলে উঠেছে। কারণ তামার তার বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বলে এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়ে বাল্বে পৌছে দেয়। আর সে কারণেই বাল্ব ঝলে উঠেছে। যদি তামার তার বিদ্যুৎ পরিবহন হতো না, ফলে বাল্বও ঝলত না। এবার তার দুটির সংযোগ খুলে এদের মাঝে লোহা, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে সংযোগ দাও। দেখ কী ঘটে? এরপর কাঠের টুকরা, প্লাস্টিক, রবার দিয়ে দুটো তারের সংযোগ কর।

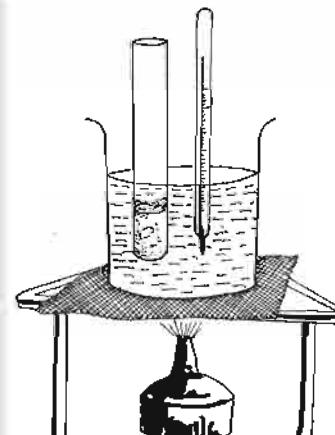
এখন কি বৈদ্যুতিক বাল্ব ঝলছে? না ঝলছে না। কারণ রবার, প্লাস্টিক, কাঠের টুকরাটি বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ চার্জ পরিবহন করতে পারছে না। তাই বাল্বটি ঝলছে না।

পাঠ ৯-১১ : গলনাক ও স্কুটনাক :

কাজ : কঠিন পদার্থের গলনাক সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি পাত, মোম, ধার্মেয়িটার, টেস্টিটিউব, স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : টেস্টিটিউবে কিছু ছেট ছেট মোমের টুকরা নাও। পাইপিং পানি নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর রাখ। চিত্রের মতো করে টেস্টিটিউব ও ধার্মেয়িটার বিকারের পানিতে ঢুবাও বাতে এদের কোনটিই পান্তের তলা স্পর্শ না করে বা গাঁথে না লাগে। স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক। ধার্মেয়িটারের ও টেস্টিটিউবে রাখা মোমের দিকে খেয়াল কর। ধার্মেয়িটারে কি তাপমাত্রা বাড়ছে? মোমের অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? ধার্মেয়িটারে তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি আসলে মোমের অবস্থা খুব ভালোভাবে খেয়াল কর।



চিত্র ৭.৪ : গলনাক নির্ণয়

মোম কি গলে যাচ্ছে? মোম গলা শুরু হলে ধার্মেয়িটারে তাপমাত্রা দেখ। কত আছে তাপমাত্রা? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? এই ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো মোমের গলনাক। তাহলে যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ, গলে তরলে রূপান্বিত হয়, এ তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের গলনাক বলে। মোমের মতো প্রতিটি কঠিন পদার্থের একটি গলনাক আছে। তোমরা বরফের গলনাক নির্ণয় কর।

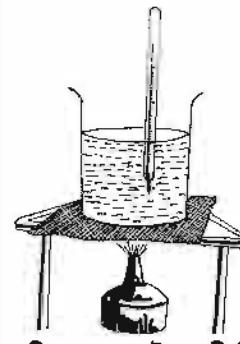
স্কুটনাক :

কোনো পানি নিয়ে তাপ দিতে থাকলে কী ঘটে? পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং একগৰ্যায়ে ফুটতে শুরু করে। যে তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাই হলো এর স্কুটনাক। পানির ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের একটি নির্দিষ্ট স্কুটনাক আছে। চলো আমরা পানির স্কুটনাক নির্ণয় করি।

কাজ : পানির স্কুটনাক নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, পানি, ধার্মোমিটার, স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : পান্তের অর্ধেক ভরে পানি দাও। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসাও। চিন্তের মতো করে ধার্মোমিটারটি পান্তে পানিতে ডুবাও। এবার তাপ দাও, আর ধার্মোমিটারে তাপমাত্রা লক্ষ কর। ধার্মোমিটারের তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি হলে সতর্কভাবে বিকারের পানি ও ধার্মোমিটারের দিকে খেয়াল কর। পানি ফুটতে শুরু করলে ধার্মোমিটারের তাপমাত্রা দেখ। এই তাপমাত্রাই হলো পানির স্কুটনাক। এই তাপমাত্রা কত? ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।



চিত্র ৭.৫ : স্কুটনাক নির্ণয়

তোমরা ইথার বা স্পিরিটের স্কুটনাক নির্ণয় করতে পার। তবে জৈব পদার্থ দাহ্য হওয়ায় সরাসরি তাপ দেওয়া যাবে না। একটি এলুমিনিয়ামের পান্তে পানি নিয়ে তাতে ইথার বা স্পিরিটের বিকারটি রেখে তাপ দিতে হবে।

আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন :

কাজ : আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : লোহার প্লেট, তামার পাত, একটি হাতুড়ি।

পদ্ধতি : এক হাতে লোহার প্লেট নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? বল বল শব্দ হলো। লোহার প্লেটটি কি আঘাতের ফলে তেঙ্গে গেল? না ভাঙলো না। একই ভাবে তোমরা তামার পাতটি নিয়েও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? লোহার প্লেটের মতো একেত্রেও ঘন ঘন শব্দ হলো, আবার পাতটি কিন্তু ভাঙলোও না। তাহলে আমরা নিচয়ই বলতে পারি যে আঘাতে ধাতব পদার্থসমূহ সাধারণত ঘন ঘন শব্দ করে এবং খুব সহজে ভাঙে না অর্থাৎ ধাতুসমূহ ভঙ্গুর নয়। এবার সালফার ও কার্বন নিয়ে ভাঙে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে দেখ। এগুলো তেঙ্গে যাবে এবং কোনো ঘন ঘন শব্দ হবে না।

সাবধানতা: গুরুক বা কয়লার ছেট টুকরা যেন ঢোকে না ঢুকে বা হাতে না লেগে থায়, সেজন্য নিরাপত্তা চশমা, হাতমোজা পরে নিতে হবে।

শীতলীকরণ :

আমরা জন্মাদিনে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে মোমবাতি জ্বালাই। এখানে কী ঘটে? মোমবাতির একটি অংশ পুড়ে আলো দেয় আর আরেকটি অংশ আঙুলে গলে মোমবাতির গা বেয়ে পড়তে থাকে যা কিছুক্ষণ পরে আবার জ্বে কঠিন মোমে পরিণত হয়। তরল মোম থেকে কঠিন মোম হওয়ার প্রক্রিয়া হলো শীতলীকরণ। মোমের ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই এমনটি হতে পারে।

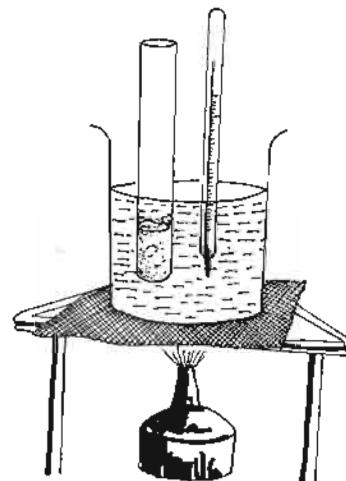
কাজ : শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি টেস্টটিউব, ১টি বিকার, ১টি স্ট্যান্ড, কিছু মোম, পানি, ১টি থার্মোমিটার, স্পিরিট ল্যাম্প, তারজালি, অ্রিপদী স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প।

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে কিছু মোম নাও। বিকারের তিন-চতুর্থাংশ ভরে পানি নাও।

অ্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপরে বিকারটি বসাও।

টেস্টটিউবটি বিকারের পানিতে চিনের মতো করে ঢুকাও। স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে মোম পুরোপুরি না গলা পর্যন্ত বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক। এবার থার্মোমিটার টেস্টটিউবের ভিতরে প্রবেশ করাও যাতে এর নিচের অংশ গলত মোমে ঢুবে থাকে। থার্মোমিটারসহ টেস্টটিউবটি বিকার থেকে তুলে এনে স্ট্যান্ডের সাথে চিনের ন্যায় আটকিয়ে রাখ। টিস্যু পেপার দিয়ে টেস্টটিউবটি মুছে ফেল। থার্মোমিটারে তাপমাত্রা ধ্বংসাল কর। যে মুহূর্তে মোম জমে যাওয়া শুরু করল সেই মুহূর্তে তাপমাত্রা কত তা দেখে নাও।



চিত্র ৭.৬ : শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয়।

কত তাপমাত্রায় মোম জমতে শুরু করল? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই তাপমাত্রা অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসই হলো মোমের হিমাংক (Freezing Point)। তোমরা মোমের গলনাংকও পেয়েছিল ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ একটি বস্তুর গলনাংক ও হিমাংক একই।

তোমরা বলতো পানির হিমাংক কত? শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে পানির গলনাংকও কিন্তু শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোনো একটি বস্তুর তাপমাত্রা যদি হিমাংকের উপরে থাকে এবং তা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তবে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় বস্তুটিকে রেখে দিলে তা ধীরে ধীরে তাপ হারাতে থাকে, ফলে এর তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং যখন তাপমাত্রা হিমাংকে চলে আসে, তখন এটি কঠিনে পরিণত হয়। যেমনটি মোমের ক্ষেত্রে হয়েছে। মোম যখন তুল অবস্থায় ছিল, তখন এর তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ছিল। মোমসহ টেস্টটিউবকে বিকার থেকে তুলে আনায় এটি ধীরে ধীরে তাপ ছেড়ে দেয়। ফলে তাপমাত্রা কমতে থাকে, এভাবে কমতে কমতে যখন তা হিমাংকে পৌছায় অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসে, তখন মোম জমে কঠিন অবস্থায় চলে আসে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা বা শিখলাম।

- যার ক্রম আছে ও যা জ্বালাগা দখল করে, তা-ই পদার্থ। অবস্থাতে পদার্থ কঠিন, তুল ও বায়বীয় -এই তিনি রূক্ষ হয়।
- কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার, আয়তন, ও দৃঢ়তা আছে। তুল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন ধাকলেও আকার ও দৃঢ়তা নেই।
- বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার, আয়তন ও দৃঢ়তা কোনোটিই নেই।
- মৌলিক পদার্থ ধাতু ও অধাতু এই দুইরকম হয়। ধাতুসমূহ সাধারণত চকচকে হয়। এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং এরা আঘাত করলে ঝলকান শব্দ হয়। ধাতুসমূহ সহজে ভাঙে না।

- অধাতুসমূহ সাধারণত চকচকে হয় না। এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে না এবং আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ করে না। অধাতুসমূহ সহজেই ভেঙে যায়।
- যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন বস্তু তরলে পরিণত হয়, ঐ তাপমাত্রাই হলো ঐ বস্তুর গলনাংক। গলনাংক ও হিমাংক পরিমাণগতভাবে একই।
- যে তাপমাত্রায় কোনো তরল বস্তু বাস্পে পরিণত হয়, ঐ তাপমাত্রাকে ঐ বস্তুর স্ফুটনাংক বলে।

অনুশীলনী

১. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর।

বাম	ডান
প্রতিটি পদার্থেরই	কোন পদার্থ নয়
শব্দ	তাপ পরিবহন করে না
কঠিন পদার্থের	নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে
ধাতব পদার্থসমূহ আঘাতে	ভর আছে
	ভেঙে যায় না

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝাও।
- আলো এক ধরনের পদার্থ এটা কী সত্য না মিথ্যা? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্যে মূল পার্থক্য কী কী?
- বৈদ্যতিক তারে তামা ব্যবহার করা হয় কেন?
- গলনাংক ও স্ফুটনাংক উদাহরণ দিয়ে বুঝাও।

বহনির্বাচনি প্রশ্ন :

- কোন পদার্থের দৃঢ়তা কম?

ক. ইট	খ. বই
গ. কলা	ঘ. বরফ
- একই পরিমাণ কোন পদার্থটি বোতলে রেখে দিলে সম্পূর্ণ বোতল জুড়ে থাকবে?

ক. পানি	খ. সেন্ট
গ. দুধ	ঘ. পাউডার

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| মাথিনের মা | মাটির পাতিলে রান্না করেন |
| মাথিনের বাবা | তামার তারের যত্ন ব্যবহার করেন |
| মাথিনের দাদি | বাঁশের ঝুঁড়ি ব্যবহার করেন |
| মাথিন | কাচের পাসে পানি পান করেন |

৩. ছক্কের কোন ব্যক্তির ব্যবহারের জিনিসটি বিদ্যুৎ ও তাগ পরিবাহী?
 ক. মাথিনের মার
 খ. মাথিনের বাবার
 গ. মাথিনের দাদির
 ঘ. মাথিনের

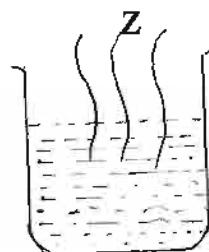
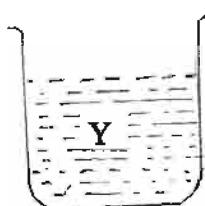
৪. তাগ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে-
 i. মাথিনের মার চেয়ে বাবা বেশি সুবিধা পায় ii. মাথিনের বাবার চেয়ে মাথিন বেশি সুবিধা পায়
 iii. মাথিনের বাবার চেয়ে দাদি কম সুবিধা পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
 ক. i ও ii
 খ. i ও iii
 গ. ii ও iii
 ঘ. i, ii ও iii

सुखमयील धर्मः

১. কঙ্গলু হক সাহেবের মা মাটির চূলায় মাটির পাতিলে রান্না করেন। অপরদিকে তার শ্রী গ্যাসের চূলায় এলুমিনিয়ামের পাতিলে রান্না করেন।

3



四

- ক. স্কুলনাইক কী?
খ. তাপ পরিবাহিতা বলতে কী বুঝায়?
গ. টিপ্পে X কীভাবে Z এ পরিণত হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. টিপ্পের তিনটি পদার্থই একক উপাদানে গঠিত বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

মিশ্রণ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা রকমের জিনিস ব্যবহার করে থাকি। এদের কোনোটি বিশুদ্ধ আর কোনোটি মিশ্রণ। মিশ্রণের মধ্যে আবার কোনোটি দ্রবণ, কোনোটি সাসপেনশন আর কোনোটি কলয়েড।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- মিশ্রণ এবং দ্রবণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার দ্রবণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- পানি এবং কঠিন পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণে তাপমাত্রার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- সমস্ত এবং অসমস্ত মিশ্রণ প্রস্তুত এবং উপাদানসমূহ পার্থক্য করতে পারব।
- লবণাক্ত পানি হতে লবণের ফটিক এবং বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনশনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে দ্রবণ ও সাসপেনশনের প্রয়োগ উপলব্ধি করব।
- পরীক্ষণ কাজের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারব।

পাঠ ১-২ :

মিশ্রণ এবং দ্রবণ

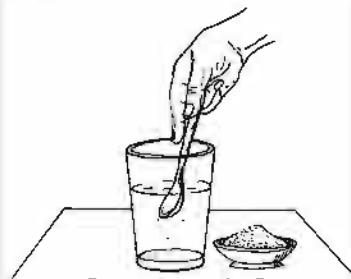
আমরা সকলেই চিনির শরবত ও ঝালমুড়ির সাথে কম বেশি পরিচিত। গ্লাসে বা জগে পানি নিয়ে তাতে কিছু চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়া দিলেই কিন্তু চিনির শরবত হয়ে যায়। আবার ঝালমুড়ি বানাতে হলে কিছু মুড়ি নিয়ে তাতে চানচুর, কিছু পিয়াজ কুচি, মরিচের কুচি, টমেটো ইত্যাদি ভালোভাবে মিশাতে হয়। চিনির শরবত ও ঝালমুড়ি উভয়ক্ষেত্রেই কিন্তু একের অধিক জিনিস আছে। এরকম একের অধিক বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে যা পাওয়া যায় তাকেই আমরা মিশ্রণ বলি।

কাজ : দ্রবণ বা সমস্ত মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের গ্লাস, চামচ, চিনি ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের গ্লাসটি ভালোভাবে ধূঁয়ে পরিষ্কার করে নাও।

গ্লাসের তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ খাওয়ার পানি নাও ও ১ চামচ চিনি যোগ করে নাড়া নাও। চিনিকে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ কি?



চিত্র ৮.১ : দ্রবণ তৈরি

না, পাচ্ছ না। কারণ, চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এবার চিনির শরবতটিকে কয়েক ভাগে ভাগ কর। প্রতিটি ভাগ থেকে এক চামচ করে খেয়ে দেখ। প্রতিটি ভাগ কি একই রকম মিষ্টি? হ্যাঁ, প্রতিটি ভাগ একই রকম মিষ্টি। কারণ হলো চিনির শরবতে চিনির কণাঙুলো পানির স্বর্থানে সুষমভাবে বা সমানভাবে বিন্যস্ত আছে।

চিনির শরবতের মতো যে সমস্ত মিশ্রণে উপাদানগুলো সুষমভাবে বাস্তিত থাকে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটিকে সহজে আলাদা করা যায় না তাদেরকেই দ্রবণ বা সমস্ত মিশ্রণ বলা হয় অর্থাৎ দ্রবণসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ। এখন তোমরা পানিতে লবণ, ঘুরোজ, ফলের রস যোগ করে দেখ প্রাপ্ত মিশ্রণগুলো সমস্ত মিশ্রণ বা দ্রবণ কি না।

কাজ : অসমস্ত মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বাটি, মুড়ি, চানচুর, পিয়াজ কুচি, মরিচ কুচি, টমেটো কুচি।

পদ্ধতি : তোমরা উপরের উপকরণগুলো মিশিয়ে ঝালমুড়ি বানাও। তোমরা কি এই মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সহজে আলাদা করতে পারছ? হ্যাঁ, খুব সহজেই একটি উপাদান থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যাচ্ছে। এবার ঝালমুড়িটিকে কয়েক ভাগে ভাগ কর। সব ভাগে কি সকল উপকরণ সমানভাবে আছে? না, নেই। কোন ভাগে মুড়ি হয়তো একটু বেশি, কোনটাতে বা পিয়াজ একটু বেশি আবার কোনটাতে হয়তো চানচুর একটু কম বা বেশি। অর্থাৎ উপাদানগুলো সুষমভাবে বাস্তিত নেই। ঝালমুড়ির মতো যে সকল মিশ্রণে উপাদানসমূহ সুষমভাবে বাস্তিত থাকে না এবং একটিকে অন্যটি থেকে সহজেই আলাদা করা যায়, তাদেরকে অসমস্ত মিশ্রণ কি না।

এখন তোমরা পানিতে গুঁড়োদুধ, মাটি, আটা, চকের গুঁড়া, ট্যালকাম পাউডার যোগ করে দেখ প্রাপ্ত মিশ্রণগুলো অসমস্ত মিশ্রণ কি না।

পাঠ ৩-৪ : দ্রব ও দ্রাবক

তোমরা বলত চিনির শরবতে চিনি ও পানির মধ্যে কোনটি বেশি এবং কোনটি কম থাকে? নিঃসন্দেহে পানির পরিমাণ বেশি আর চিনির পরিমাণ কম থাকে। এখানে পানি চিনিকে দ্রবীভূত করেছে আর চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়েছে। দ্রবণে সাধারণত যেটি বেশি পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত করে, তাকে বলে দ্রাবক আর যেটি কম পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত হয় তাকে বলে দ্রব। তাহলে বলা যায় যে,

$$\text{দ্রবণ} = \text{দ্রব} + \text{দ্রাবক}$$

চিনির শরবতে দ্রাবক হলো পানি আর দ্রব হলো চিনি।

জলীয় দ্রবণ

উপরে দেওয়া চিনির শরবতের মতো যে সমস্ত ক্ষেত্রে পানি দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকেই জলীয় দ্রবণ বলা হয়। সকল দ্রবণের ক্ষেত্রেই দ্রাবক যে পানি হবে তা কিন্তু নয়। পানি ছাড়াও বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তু যেমন এসিটোন, স্পিরিট, ইথারও দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

দ্রবণের ঘনমাত্রা : পাতলা ও ঘন দ্রবণ

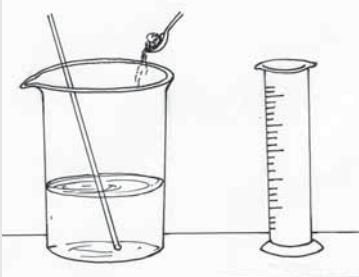
দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের পরিমাণ কম-বেশি করে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যায়। ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে দ্রবণকে পাতলা বা ঘন বলা হয়। এবার তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যাক।

কাজ : ঘন ও পাতলা দ্রবণ তৈরি ও পার্থক্যকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : দুটি কাচের গ্লাস, মাপচোঙ, চামচ, চিনি ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের গ্লাস দুটি ভালোভাবে ধূয়ে পরিষ্কার করে নাও। প্রতিটি গ্লাসে বা বিকারে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ১০০ মিলিলিটার করে খাওয়ার পানি নাও। একটি গ্লাসে ১ চামচ ও অপরটিতে ৩ চামচ চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়া দাও। এবার উভয় গ্লাস থেকে ১ চামচ করে দ্রবণ বা শরবত নিয়ে খেয়ে এদের মিষ্টতা পরীক্ষা কর।

(বি.দ্র: বেশিরভাগ রাসায়নিক পদার্থই মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই কোন দ্রবণ বা রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে পুরোপরি জানা না থাকলে এটি খেয়ে স্বাদ পরীক্ষা করা কোনো মতেই উচিত নয়)।



চিত্র ৮.২ : পাতলা ও ঘন দ্রবণ তৈরি

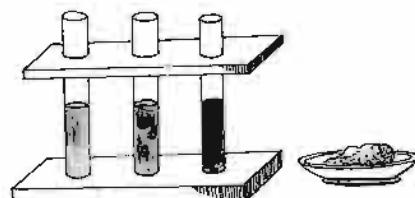
যে গ্লাসে ৩ চামচ চিনি দেওয়া হয়েছে, সেটি বেশি মিষ্টি লাগছে। চিনির শরবতের মতো সমান আয়তনের দ্রবণের ক্ষেত্রে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, সেটি ঘন দ্রবণ আর যেটিতে তুলনামূলকভাবে দ্রবের পরিমাণ কম থাকে, সেটি হলো পাতলা দ্রবণ।

আবার যদি এমন হয় যে, দুটি শরবতে চিনির পরিমাণ একই রেখে (যেমন: ১ চামচ) তিনি ভিন্ন পরিমাণ পানি নেয়া হয় তবে যেটিতে পানির পরিমাণ কম থাকবে সেটি বেশি মিষ্ঠি হবে অর্থাৎ এটিকে আমরা ঘন দ্রবণ বলতে পারি। আর যেটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকবে, সেটি কম মিষ্ঠি হবে অর্থাৎ সেটিকে আমরা পাতলা দ্রবণ বলতে পারি।

বর্ণিল জলীয় দ্রবণ দেখে এটি পাতলা না ঘন তা বুঝার উপায় নেই। তবে রঙিন দ্রবণের ক্ষেত্রে তিনি ঘনমাত্রার দ্রবণসমূহ কোনটি পাতলা, কোনটি ঘন তা বোঝা যায়, ঠিক যেমন করে আমরা পাতলা ডাল ও ঘন ডালের পার্থক্য করতে পারি (উল্লেখ্য, ডাল কিন্তু দ্রবণ নয়, একটি অসম্মত মিশ্রণ)। এখন আমরা দেখব কীভাবে ঘন ও পাতলা দ্রবণের পার্থক্য করা যায়।

কাজ : তিনি ভিন্ন ঘনমাত্রার রঙিন জলীয় দ্রবণ তৈরি করে তা থেকে ঘন ও পাতলা দ্রবণের পার্থক্যকরণ।

যোগাযোগী উপকরণ : তিনটি টেস্ট টিউব, টেস্টটিউব ধারক, মাপচোঙ, চামচ, তুঁতে ও পানি।



চিত্র ৮.৩ : রঙিন দ্রবণ তৈরি

পরীক্ষা : তিনটি পরিষ্কার টেস্টটিউব নাও। এবার টেস্টটিউবগুলোকে টেস্টটিউব ধারকে পরপর সাজিয়ে রাখ। প্রতিটি টেস্টটিউবে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ৫ মিলিলিটার করে পানি নাও। প্রথম টেস্টটিউবে ১ চামচ, দ্বিতীয় টেস্টটিউবে ২ চামচ ও অপরটিতে ৩ চামচ তুঁতে যোগ করে তুঁতের দানাগুলো পুরোপুরি পানিতে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত ভালো করে বাঁকাও। টেস্টটিউবগুলোকে টেস্টটিউব ধারকে যার যার জায়গায় আগের মতো সাজিয়ে রাখ।

তোমরা সবগুলো দ্রবণ কি সমান নীল দেখতে পাইছ? না, তা নয়। যেটিতে সবচেয়ে কম পরিমাণ তুঁতে যোগ করেছ, সেটি সবচেয়ে কম নীল দেখাচ্ছে। অর্থাৎ সেটি সবচেয়ে পাতলা দ্রবণ। এভাবে তুঁতের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দ্রবণের রং আস্তে আস্তে গাঢ় হয়েছে অর্থাৎ দ্রবণের ঘনমাত্রা পাতলা থেকে ঘন হয়েছে। একই ভাবে তোমরা পটাসিয়াম পারমাইটেট ও পটাসিয়াম ডাই ক্রোমেটের দ্রবণ তৈরি করে পাতলা ও ঘন দ্রবণের পার্থক্য করতে পার।

পাঠ ৫-৭ : সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ

কাজ : সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি।

যোগাযোগী উপকরণ : একটি বিকার, মাপচোঙ, নাড়ানি, লবণ ও পানি।

পরীক্ষা : বিকারটি ভালোভাবে ধূয়ে পরিষ্কার করে নাও। বিকারে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ১০০ মিলিলিটার পানি নাও। এবার বিকারের পানিতে অল্প অল্প করে লবণ যোগ করে নাড়তে থাক। এভাবে লবণ যোগ করতেই থাক আর নাড়তেই থাক যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ করা লবণ অনেক নাড়লেও আর দ্রবীভূত না হয়।

ক্রমাগত লবণ যোগ করতে থাকলে একপর্যায়ে লবণ যোগ করে অনেক বেশি নাড়লেও লবণ আর দ্রবীভূত হয় না কেন? এর কারণ হলো লবণ যোগ করতে করতে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়েছে যখন দ্রাবক (পানি) আর দ্রবকে (লবণকে) দ্রবীভূত করতে পারছে না। তাহলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। পক্ষান্তরে কোনো দ্রবণে যদি ঐ সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণের দ্রব দ্রবীভূত থাকে, তবে ঐ দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণ হবে।

উপরের কাজে যোগকৃত লবণ অদ্রবীভূত হওয়ার আগের সকল অবস্থাকেই আমরা অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলতে পারি। সম্পৃক্ত দ্রবণে সামান্য পরিমাণ দ্রব যোগ করে অনেক নাড়লেও দ্রব আর দ্রবীভূত হয় না, পক্ষান্তরে অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রব যোগ করে নাড়া দিলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত দ্রব দ্রবীভূত হতেই থাকে।

দ্রবণীয়তা

তোমরা উপরের অনুচ্ছেদে সম্পৃক্ত দ্রবণ কী তা জানলে। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম দ্রাবক নিয়ে কোনো দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, 25° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ৩৬ গ্রাম লবণকে দ্রবীভূত করতে পারে। অর্থাৎ এই তাপমাত্রায় পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা হলো ৩৬ গ্রাম। আবার 25° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে চিনির দ্রবণীয়তা হলো ২১১.৪। অর্থাৎ এই তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ২১১.৪ গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করতে পারে।

তরল-তরল দ্রবণ

যেসব দ্রবণে দ্রাবক হিসাবে তরল পদার্থ আর দ্রব হিসাবে কঠিন পদার্থ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো তরল-কঠিন দ্রবণ। যদি এমন হয় যে, দ্রব ও দ্রাবক উভয়ই তরল পদার্থ তাহলে ঐ দ্রবণকে তরল-তরল দ্রবণ বলা হয়। আমরা এক প্লাস পানি নিয়ে তাতে যদি এক চামচ লেবুর রস যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিই, তাহলেই একটি তরল-তরল দ্রবণ পাওয়া যাবে। একইভাবে ভিনেগার বা এসিটিক এসিড ও পানি দিয়েও তরল-তরল দ্রবণ তৈরি করা যায়।

তরল-গ্যাস দ্রবণ

এবার আমরা কিছু দ্রবণ দেখি, যেখানে দ্রাবক হলো তরল পদার্থ আর দ্রব হলো গ্যাসীয় পদার্থ। কোমল পানীয় যেমন : কোকা কোলা, সেভেন আপ আমরা সবাই চিনি। এ সমস্ত কোমল পানীয়ের বোতল খোলার সাথে সাথে হিস্স শব্দ করে বুদবুদ আকারে গ্যাসীয় পদার্থ বের হয়। এ গ্যাসীয় পদার্থটি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড যা পানীয়ের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ কোমল পানীয়গুলোকে আমরা তরল-গ্যাস দ্রবণ বলতে পারি।

তোমরা কি জান পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ (যেমন: মাছ) তাদের নিঃশ্঵াসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কোথা থেকে পায়? তারা তো আমাদের মতো সরাসরি বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ অক্সিজেন নেয় পানিতে থাকা দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে। তাহলে নদ-নদী, খাল বিল বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের পানি কিন্তু এক ধরনের তরল-গ্যাস দ্রবণ। এ কথা সত্য যে এই সমস্ত প্রাকৃতিক পানিতে অক্সিজেন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুই দ্রবীভূত থাকে।

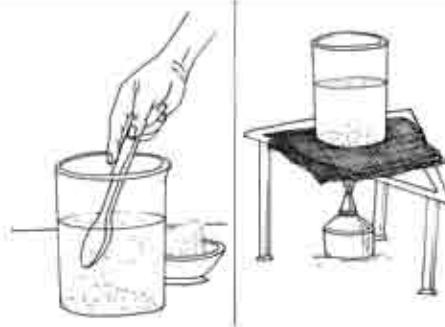
আবার ইদানীং বঙ্গ সমালোচিত ফরমালিনও (যা আইনবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন ফল ও মাছের সংরক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে) পানিতে ফরমালডিহাইড নামক গ্যাসের দ্রবণ।

মুখ্যে ভাসের অভিয

কাজ : মুখ্যে ভাসের অভিয পর্যবেক্ষণ।

ধরনোজ্ঞীয় উপকরণ : একটি বিকার, নাড়ানি, বিপদি স্ট্যান্ড, তারজালি, একটি নিক্তি, সবশ, পানি ও স্পিন্ডল ল্যাম্প।

গুরুত্ব : একটি পরিকার বিকারে ১০০ গ্রাম পানি নিক্তি দিয়ে মুখ্যে ভাসে নাও। ধীরে ধীরে সবশ ঘোগ করে নাড়তে থাক। মোগফূত সবশ যদি আর মুরীভূত না হয়, তাহলে সবশ ঘোগ করা বন্ধ কর। এবার বিপদি স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপর বিকারাটিকে বসাও এবং স্পিন্ডল ল্যাম্প দিয়ে বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক ও নাড়তে থাক।



চিত্র ৮.৩ : মুখ্যে ভাসের অভিয পর্যবেক্ষণ

তাপ দেয়ার পর মুখ্যটিকে কি কোনো পরিবর্তন থাক করা যায়ে? হ্যাঁ, আজ্ঞে আজ্ঞে অনুরীভূত সবশের পরিমাণ কমতে থাক কর্যেছে। এজ্ঞাবে আরও কিছুক্ষণ তাপ দিতে থাকলে সম্পূর্ণ সবশই মুরীভূত হয়ে যাবে। তাহলে এটি বলা যাব যে, তাপমাত্রার বাঢ়ার কারণে পানিতে সবশের মুখ্যীভূতা বেড়েছে আর সে কারণেই অনুরীভূত সবশ তাপ দেয়ার পরে মুরীভূত হয়েছে। তবে কিছু কিছু মুখ্যের ক্ষেত্রে (যেমন : পানিতে সিরিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম হাইড্রজাইট) মুখ্যীভূতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে যায়।

পাঠ ৮-৩ : সার্বজনীন ম্রাবক

মুখ্যে ম্রাবক সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনেছে। সার্বজনীন ম্রাবক বলতে কী মুখ্যো? এটি হবে এমন কিছু ম্রাবক, যা সব রকমের পদার্থকে মুরীভূত করতে পারবে। ধৰকম কোন ম্রাবক কি বাস্তবে পাওয়া সম্ভব? সম্ভবত নয়। তবে অনেক রকমের পদার্থকে মুরীভূত করতে পাওয়ে এমন একমাত্র ম্রাবক হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত পানি। অর্থাৎ পানিই হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাওয়া একমাত্র সার্বজনীন ম্রাবক। পানি একদিকে বেয়ন অস্থির অংশের পদার্থকে (ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সিলিকা ইত্যাদি ছাড়া) মুরীভূত করতে পাওয়ে, তেমনি অন্যদিকে অনেক জৈব ঘোগ (যেমন স্পিন্ডল, এসিটোল, এসিটিক এসিড) ও গ্যাসীয় পদার্থকেও মুরীভূত করতে পাওয়ে।

হাতের কাছে পাওয়া যাব এমন সামাজিক জৈব ও অংশের পদার্থ নিয়ে তোমরা পানিতে এসের মুখ্যীভূতা পরীক্ষা করে দেখ।

সমষ্টি মিশ্রণ ঘটনা ও পৃথকীকরণ

এই অধ্যায়ের অন্ততে আমরা সমষ্টি মিশ্রণের কিছু উদাহরণ সেখেছি। এখন দেখব কীভাবে এ সকল মিশ্রণ ঘটত ও তাদের উপাদানসমূহকে পৃথক করা যায়।

কাজ : সমস্ত মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, চামচ, নাড়ানি, গুকোজ ও পানি।

পদ্ধতি : বিকারটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলিলিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেয়া যেতে পারে) পানি মাপচোঙ দিয়ে মেপে নাও। এবার ৪-৫ চামচ গুকোজ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। গুকোজের কণাগুলোকে আর দেখতে পাচ্ছ কি? না, মোটেও না। কারণ গুকোজের দানাগুলো সম্পূর্ণরূপে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। গুকোজ ও পানির মিশ্রণটি সমস্ত হয়েছে কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পুরো মিশ্রণটিকে সমান চার ভাগে ভাগ কর। প্রতিটি ওয়াচ প্লাসের আলাদা আলাদা ভর মেপে নাও ও লিখে রাখ। এবার প্রতিটি ওয়াচ প্লাস ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে স্প্রিট ল্যাস্পের সাহায্যে তাপ দিয়ে পানি পুরোপুরি শুকিয়ে ফেল। ওয়াচ প্লাসগুলোকে ঠাণ্ডা করে প্রতিটির ভর মেপে নাও। প্রতিটি ওয়াচ প্লাসের পরের ভর ও আগের ভরের পার্থক্য থেকে প্রাপ্ত গুকোজের ভর হিসেব কর।

এবার দেখ তোমরা প্রতিটি পাত্রে সমান পরিমাণ গুকোজ পেয়েছ কি? হ্যাঁ, প্রতিটি পাত্রে পাওয়া চিনির পরিমাণ সমান। অতএব বলা যায় যে পানি ও গুকোজের মিশ্রণটি সমস্ত ছিল। তা না হলে কোন ভাগে গুকোজ বেশি আবার কোনটাতে কম পাওয়া যেত।

যে প্রক্রিয়ায় তাপ দিয়ে পানি শুকিয়ে ফেললে তার নাম জান কি? এটি হলো বাস্পীভবন। অর্থাৎ তাপ দিয়ে তরল পদার্থকে বাস্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই বাস্পীভবন বলে। তোমাদের কি মনে হয় বাস্পীভবন ছাড়া আর কোনো সহজ পদ্ধতিতে গুকোজকে পানি থেকে আলাদা করা যাবে? না, এটিই একমাত্র উপায়, যা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।

অসমস্ত মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ :**কাজ : অপরিষ্কার লবণ ও পানির অসমস্ত মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ।**

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার বা কাচের প্লাস, চামচ, নাড়ানি, অপরিষ্কার লবণ ও পানি।

পদ্ধতি : বিকার বা কাচের প্লাসটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলি লিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেয়া যেতে পারে) পানি নাও। এবার ১-২ চামচ অপরিষ্কার লবণ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ রেখে দাও।

কী দেখতে পাচ্ছ? লবণের কণাগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে আর ময়লার ভারি কণাগুলো বিকারের তলায় জমতে শুরু করেছে। অন্যদিকে হালকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়লার কণাগুলো পানিতে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ ময়লার কণাগুলো পানিতে সুষমভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে না অর্থাৎ এটি নিশ্চিত যে মিশ্রণটি লবণ-পানি-ময়লার একটি অসমস্ত মিশ্রণ।

ময়লার কণাগুলো যে সুষমভাবে বিন্যস্ত নয় সেটি কীভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায়? আগের কাজের মতো সমান কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগ থেকে পানি পুরোপুরি বাস্পায়িত করে প্রতি ভাগে অবশিষ্ট বস্তুর ভর পরিমাপ করলেই দেখা যাবে একেক ভাগে একেক পরিমাণ বস্তু রয়েছে।

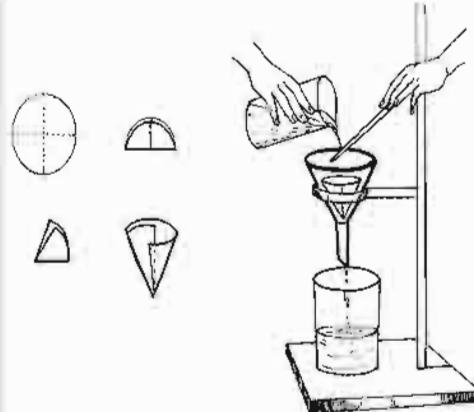
বলত এই মিশ্রণ থেকে আমরা কি কোনোভাবে অদ্বশীয় ময়লার কণা দূর করতে পারি? ছানুনি দিয়ে চা পাতা যেভাবে লিকার থেকে আলাদা করা হয়, ঠিক একইভাবে আমরা অদ্বশীয় বস্তুর কণাগুলোকেও মিশ্রণ থেকে আলাদা করতে পারি। এবার দেখে নিই কীভাবে ফিল্টার কাগজ দিয়ে ময়লার কণাগুলো সবশ পানি থেকে আলাদা করে পরিষ্কার সবশ পাওয়া যায়।

কাজ : অপরিষ্কার সবশ হতে বিশুদ্ধ সবশ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : অপরিষ্কার সবশের অসমষ্টি মিশ্রণ, নাড়ানি, ত্রিপদি স্ট্যান্ড, তারজালি, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, রিহ্যুক স্ট্যান্ড, পানি।

পদ্ধতি : একটি ফিল্টার কাগজ নিয়ে প্রথমে সমান চার ভাঁজ কর। এরপর চিন্দের মতো করে একদিকে তিন ভাঁজ ও অন্যদিকে এক ভাঁজ রেখে ফানেলের তিতারে বসিয়ে দাও। ফিল্টার কাগজটিকে পরিষ্কার পানি দিয়ে অঙ্গ করে তিজিয়ে নাও যাতে এটি সরে না যায়। ফানেলটি চির অনুযায়ী স্ট্যান্ডের সাথে স্বৃক্ষ রিহ্যুকের উপর বসাও। ফানেলের নিচে একটি বিকার রাখ। অতঃপর আগের কাজের অপরিষ্কার সবশের অসমষ্টি মিশ্রণটি ফিল্টার পেপারের উপর আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত ফানেল থেকে পরিষ্কার পানি পড়া শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

মিশ্রণটি ফানেলে ঢালার পর কী ঘটল? মাটির কণামুক্ত পরিষ্কার সবশ-পানি থারে থারে ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে নিচে রাখা বিকারে জমা হলো আর মাটির কণাগুলো ফিল্টার কাগজের উপরে আটকে রাইল। মাটির কণাগুলোকে ফিল্টার কাগজ দিয়ে মাটি ও পানির মিশ্রণ থেকে আলাদা করার এই প্রক্রিয়ার নাম হলো পরিস্রাবণ অর্থাৎ পরিস্রাবণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা যায়।



চিত্র ৮.৫ : পরিস্রাবণ

এবার পরিষ্কার সবশ-পানির বিকারটিকে ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাঙ্কের সাহায্যে তাপ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি উকিয়ে ফেল। বিকারের পানি পুরোপুরি উকিয়ে যাওয়ার পর তোমরা কী পেলে? সাদা ধৰধৰে ও পরিষ্কার সবশের স্তর পেয়েছে। কারণ শুরুতে নেয়া ময়লামুক্ত সবশ থেকে সকল ময়লা ফিল্টার কাগজ দিয়ে পরিস্রাবণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে।

পাঠ ১০-১২ :

সবগাত্ত পানি হতে সবগের ক্ষটিক প্রস্তুতকরণ

আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে পরিস্রাবণ ও বাস্পীভবনের মাধ্যমে পরিষ্কার সবশের প্রস্তুত প্রণালি দেখেছি। ঐ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সবশ কিন্তু দানাদার ছিল না, ছিল সবগের স্তর যা মূলত অদানাদার সবশ। এখন আমরা সবগাত্ত পানি হতে সবগের ক্ষটিক প্রস্তুতকরণের কৌশল দেখব।

কাজ : লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বিকার, চামচ, নাড়ানি, টিপদি স্ট্যান্ড, তারজালি, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, রিং মুক্ত স্ট্যান্ড, কিছু অপরিকার লবণ ও পানি।

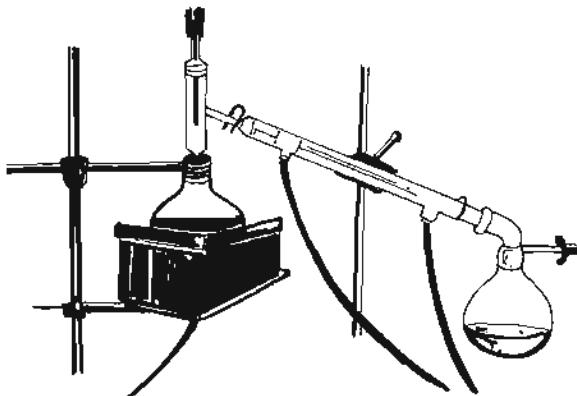
পদ্ধতি : একটি বিকারে ২০০ মিলি লিটার পানি ও ৫০ গ্রাম অপরিকার লবণের একটি মিশ্রণ তৈরি করে পরিষ্কারণের মাধ্যমে লবণ-পানির দ্রবণ অর্ধাং লবণাক্ত পানি বানাও। এবার লবণাক্ত পানি একটি বিকারে নিয়ে বিকারকে টিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে তাপ দিতে থাক। তাপ দিতে দিতে বিকারে লবণাক্ত পানির আয়তন ও আয় অর্ধেকে পরিণত হলে তাপ দেয়া বন্ধ কর। অতঃপর বিকারে একটি ঢাকনা দিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য রেখে দাও।

বিকারটি ঠাণ্ডা হওয়ার পরে তোমরা কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? বিকারের তলায় বা গায়ে লবণের দানা জমা হতে শুরু করেছে। এই দানাসূক্ত লবণই হলো লবণের স্ফটিক। লবণের স্ফটিক তৈরির এই পদ্ধতিকে বলা হয় স্ফটিকীকরণ। অনেক সময় লবণাক্ত পানি হতে স্ফটিক পাওয়ার জন্য এতে দুই একটি লবণের দানা বাইরে থেকে যোগ করতে হয়। এতে যোগকৃত লবণ দানাকে ঘিরে খুব দ্রুত দানাদার লবণ জমা হতে থাকে।

লবণাক্ত পানি হতে বিশুক পানি প্রস্তুতকরণ :

লবণাক্ত পানি অথবা যেকোনো মিশ্রণ হতে বিশুক পানি প্রস্তুত করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে পাতল পদ্ধতি, যার জন্য প্রয়োজন একটি পাতল যন্ত্র। চিত্র-৮.৬ এ একটি পাতল যন্ত্র দেখানো হলো :

পাতল যন্ত্রিত বায় পাশে রয়েছে পরীক্ষাধীন
লবণাক্ত পানি নেওয়ার জন্য একটি গোলতলী
ফ্লাক (১)। এর সাথে সংযুক্ত আছে একটি
শীতক (condenser) (২) যার ভিতরে
একটি সরু কাচের নল (৩) বসানো আছে এবং
ঐ নলের চারপাশে ঠাণ্ডা পানির প্রবাহের জন্য
একটি প্রবেশ নল (৪) ও একটি লিঙ্গমন নল



চিত্র-৮.৬ : পাতল যন্ত্র

(৫) আছে। আর ডান পাশে বিশুক পানি সংগ্রহ করার জন্য আছে আরেকটি গোলতলী ফ্লাক (৬)। এছাড়া পানিতে তাপ দেওয়ার জন্য একটি বৈদ্যুতিক হিটার (৭) আর তাপমাত্রা মাপার জন্য বায় পাশের ফ্লাকের উপরে থার্মোমিটার (৮) বসানোর জন্য ও শীতকের সাথে যুক্ত করার জন্য একটি কাচের এডাপ্টার (৯) রয়েছে। এছাড়া ফ্লাক দুটি ও শীতককে সঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য স্ট্যান্ড (১০) ও ক্ল্যাম্প (১১) রয়েছে। এবার দেখা যাক পাতল যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে?

কাজ : লবণাক্ত পানি হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুতকরণ ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি পাতন যন্ত্র, ৫০০ মিলিলিটার লবণাক্ত পানি ।

পদ্ধতি : চিত্র ৮.১ এর মতো করে পাতন যন্ত্রটি সাজিয়ে গোলতলী ফ্লাক্স (১) এ লবণাক্ত পানি নাও। পাতন যন্ত্রটির পানি প্রবেশের নলটি (৪) একটি পানির ট্যাগের সাথে সংযুক্ত করে পানির প্রবাহ চালু কর। পানি নির্গমনের নলের সাথে একটি প্লাস্টিকের পাইপ যুক্ত করে বেসিনে রাখ। এবার বৈদ্যুতিক হিটার দিয়ে তাপ দিতে থাক। বৈদ্যুতিক হিটারের ব্যবস্থা না থাকলে স্প্রিট ল্যাম্প বা অন্য যেকোনো উপায়ে তাপ দেয়া যেতে পারে। পাতন যন্ত্রের থার্মোমিটারে তাপমাত্রা খেয়াল কর। বাস্পীভূত পানি শীতকের সরু নলের মধ্য দিয়ে গোলতলী ফ্লাক্স (৭) জমা হতে শুরু করলে অপেক্ষা করতে থাক। গোলতলী ফ্লাক্স (১) এ পানির পরিমাণ তিন-চতুর্থাংশ করে গেলে তাপ দেয়া বন্ধ কর।

তাপ দেয়ার পর কী ঘটে? থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানি ফুটতে শুরু করে ও বাস্পে পরিণত হয়। উক্ত বাস্প শীতকে প্রবেশ করলে প্রবাহিত ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে তা তরলে পরিণত হয়। বাস্প তরলে পরিণত হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে। ঘনীভূত পানি ফোঁটায় ফোঁটায় গ্রাহক ফ্লাক্সে জমা হতে থাকে। এই জমা হওয়া পানিই বিশুদ্ধ পানি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পানির কোনো মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ পানি তৈরি করতে আয়াদের দুটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়। এদের একটি হলো বাস্পীভবন আর অন্যটি ঘনীভবন। তোমরা কি এখন সমুদ্রের পানি থেকে বিশুদ্ধ পানি তৈরি করতে পারবে?

সাসপেন্সন ও কলয়েড

কাজ : সাসপেন্সন তৈরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের গ্লাস, চামচ, কাদামাটি ও পানি ।

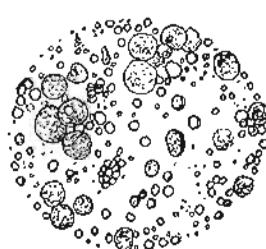
পদ্ধতি : কাচের গ্লাসের তিন-চতুর্থাংশ ভরে পানি নাও। ১ চামচ পরিমাণ কাদামাটি গ্লাসে যোগ করে খুব ভালোভাবে নাড়া দাও। মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দাও। কী দেখতে পাচ্ছ? প্রথমে পুরো মিশ্রণটি ঘোলা দেখাচ্ছে। রেখে দেয়ার পর তুলনামূলকভাবে ভারি মাটির কণাগুলো গ্লাসের তলায় জমা হচ্ছে, তবে কিছু কিছু মাটির কণা যেগুলো খুব হাঙ্কা ও ছোট ছোট তারা পানিতে ভাসমান অবস্থায়ই থাকছে আর মিশ্রণটি অল্প ঘোলাটে দেখাচ্ছে। তোমরা আরও কিছু সময় মিশ্রণটি কোনো নাড়াচড়া না করে রেখে দাও। মিশ্রণটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ, মাটির আরও কিছু স্কুদ কণা তলায় জমা পড়ছে তবে পানি পুরোপুরি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কারণ কিছু কিছু স্কুদ কণা তখনও পানিতে ভাসমান অবস্থায় থেকেই যাচ্ছে।

মাটি ও পানির এ জাতীয় মিশ্রণ যা রেখে দিলে উপাদানসমূহ আংশিক আলাদা হয়ে যায় তাকেই সাসপেন্সন বলে। একইভাবে, চক মিহি করে গুঁড়া করে বা আটা পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিলে যে মিশ্রণ পাওয়া যায় সেগুলোও সাসপেন্সন। আমরা বাড়িতে যে সকল এন্টিবায়োটিক বা এন্টাসিডের সাসপেন্সন ব্যবহার করি, সেগুলোও রেখে দিলে আংশিক আলাদা হয়ে যায় ও ঔষধের বোতলের নিচে তলানি পড়ে যায়। তাই ঔষধ সেবনের পূর্বে বোতল ভালো করে ঝাকিয়ে নিতে হয়।

এবার তোমরা দ্রবণ, সাসপেন্সন ও অসমস্ত মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছ কি? অসমস্ত মিশ্রণে উপকরণগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও আলাদা করা যায়। সাসপেন্সনের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো চিহ্নিত করা গেলেও সহজে আলাদা করা যায় না আর দ্রবণের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো চিহ্নিত করা যায় না, সহজে আলাদাও করা যায় না।

এবার আসা যাক কলয়েডের কথায়। সাসপেন্সনের বেলায় আমরা দেখলাম, একটি উপকরণের ছোট ছোট কণাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু অনেকক্ষণ রেখে দিলে তা তলানি হিসেবে জমা পড়ে। কিন্তু এমন হতে পারে না যে, কণাগুলো এতই ক্ষুদ্র ও হাঙ্কা যে তারা কখনই পাত্রের তলায় জমা হতে পারবে না, সব সময়ই ভাসমান বা সাসপেন্ডেড অবস্থায়ই থাকবে। হ্যাঁ অবশ্যই পারে, আর সে ধরনের মিশ্রণ যেখানে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকণা অপর বস্তুকণার মাঝে সাসপেন্ডেড বা ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং রেখে দিলে কখনই কোনো তলানি পড়ে না তাকে বলা হয় কলয়েড।

কলয়েডে বিদ্যমান উপাদানগুলো একটি আরেকটিতে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু ছড়িয়ে থাকে। কলয়েডে যেটি অধান উপাদান বা পরিমাণে বেশি থাকে, তাকে বলে অবিচ্ছিন্ন ফেজ বা দশা (Continuous Phase) আর যেটি কম পরিমাণে থাকে বা ছড়িয়ে থাকে, তাকে বলে ডিসপারসড ফেজ বা দশা (Dispersed Phase)। যেমন : দুধ হচ্ছে একটি কলয়েড, যা পানি ও চর্বি দিয়ে তৈরি। চর্বির ক্ষুদ্র কণাগুলো (Dispersed Phase) পানিতে (Continuous Phase) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঠিকই দেখা যায়। চিত্র-৮.৭ এ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া দুধের একটি ছবি দেখানো হলো।



চিত্র ৮.৭ কলয়েড

দুধের মতো কুয়াশা হচ্ছে আরেকটি কলয়েড, যেখানে পানির ছোট ছোট কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। আবার আমাদের অতি পরিচিত অ্যারোসলও কিন্তু এক ধরনের কলয়েড, যেখানে তরল কীটনাশকের কণাগুলো বাতাসে ডেসে থাকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কলয়েড তৈরির জন্য ভাসমান ক্ষুদ্র কণাগুলোর আকার কত হ্রেট হতে হবে? সাধারণত কলয়েডে বিদ্যমান ভাসমান কণাগুলোর আকার ১-১০০০ ন্যানোমিটার হয়ে থাকে। আর যদি কণাগুলোর আকার ১ মাইক্রোমিটার বা তার বেশি হয়, তখন এটি আর কলয়েড না হয়ে সাসপেন্সনে পরিণত হয়।

এ অধ্যায় আমরা যা শিখলাম :

একের অধিক বিশুদ্ধ পদার্থ মিশালে মিশ্রণ তৈরি হয়।

দ্রবণসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ, যেখানে দ্রব দ্রাবকে সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে ও একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায় না।

অসমস্ত মিশ্রণে উপাদানগুলি মিশ্রণের সর্বত্র সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে না এবং একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায়।

দ্রবণে যেটি বেশি পরিমাণে থাকে ও দ্রবীভূত করে সেটি হলো দ্রাবক আর যেটি কম পরিমাণে থাকে ও দ্রবীভূত হয় সেটি হলো দ্রব।

সম্পরিমাণ দুটি দ্রবণের মধ্যে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে তার ঘনমাত্রা বেশি হয়।

সম্পৃক্ত দ্রবণে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে।

১০০ গ্রাম দ্রাবকে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে।

তাপ দিলে কোনো কোনো দ্রবের দ্রবণীয়তা বাড়ে আবার কোনো কোনো দ্রবের দ্রবণীয়তা কমে।

পরিস্রাবণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের অসমস্ত মিশ্রণ থেকে উপাদানসমূহকে আলাদা করা যায়।

তাপের প্রভাবে তরল পদার্থকে বাস্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বাস্পীভবন বলা হয়।

ঘনীভবন হলো বাস্পকে শীতল করে তরলে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া।

সাসপেনসন হলো এমন একটি মিশ্রণ, যা রেখে দিলে উপাদানসমূহ আঁশিকভাবে আলাদা হয়ে যায়।

কলয়েড এক ধরনের মিশ্রণ, যেখানে একটি উপাদানের ক্ষুদ্র কণা অন্য উপাদানে ছড়িয়ে থাকে।

অনুশীলনী

উপযুক্ত শব্দ/বাক্য দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১. পানি ও স্পিরিটের দ্রবণ একটিদ্রবণ।
২. বর্ণহীন জলীয় দ্রবণ ঘন না পাতলা।
৩.একটি সার্বজনীন দ্রাবক।
৪. দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ থাকে আর দ্রাবকের পরিমাণ থাকে।
৫. দুধ ও কুয়াশা হলো.....

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোনটি তরল গ্যাস দ্রবণ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. লেবুর শরবত | খ. কোমল পানীয় |
| গ. ভিনেগার | ঘ. স্যালাইন |

২. কোনটি কলয়েড?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. চক ও পানি | খ. আটা ও পানি |
| গ. চর্বি ও পানি | ঘ. মাটি ও পানি |

উচ্চীগতের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কক্ষ তাপমাত্রায় সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণীয়তা ২১.৬ গ্রাম

৩. ২০০ গ্রাম পানি নিয়ে সোডিয়াম কার্বনেটের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কতটুকু সোডিয়াম কার্বনেট লাগবে?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. ২.১৬ গ্রাম | খ. ৪.৩২ গ্রাম |
| গ. ২১.৬ গ্রাম | ঘ. ৪৩.২ গ্রাম |

৪. সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণীয়তা যদি ১০ গ্রাম কম হয় তবে দ্রবণটি-

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ক. সম্পৃক্ত দ্রবণ | খ. অসম্পৃক্ত দ্রবণ |
| গ. সাসপেনসন | ঘ. কলয়েড |

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. দ্রবণ কাকে বলে? দ্রবণ ও মিশ্রণের মূল পার্থক্য কী?
২. দ্রবণীয়তা বলতে কী বুঝায়?
৩. তরল-গ্যাস দ্রবণ বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৪. সাসপেন্সন কাকে বলে?
৫. কলয়েড ও সাসপেন্সন কী একই? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

সূজনশীল প্রশ্ন :

১. কঞ্চবাজারে সমুদ্রের পানিতে নেমে প্রিয়ন্তি ও রূপস্তি খুব আনন্দ করছিল। হঠাতে সমুদ্রের পানি রূপস্তির মুখে যাওয়ায় সে লক্ষ করল সমুদ্রের পানি নোনতা। এর কারণ প্রিয়ন্তিকে জিজেস করায় সে রূপস্তিকে বলল, এটি পানি ও লবণের দ্রবণ। এ থেকেই লবণ তৈরি করা হয়। রূপস্তি অবাক হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইল। বাড়িতে এসে প্রিয়ন্তি রূপস্তিকে লবণ তৈরি করে দেখাল।
 - ক. মিশ্রণ কী?
 - খ. পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কেন?
 - গ. রূপস্তিকে দেখানো প্রিয়ন্তির উপাদানটির প্রস্তুত প্রণালি রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।
 - ঘ. দ্রবণটি থেকে দুটি উপাদানই আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব বিশ্লেষণ কর।
২. ঔষধ খাওয়ানোর সময় আদিল প্রতিবারই লক্ষ করে মা ঔষধের বোতল ঝাঁকিয়ে নেন। কিন্তু দুধ খাওয়ানোর সময় ঝাঁকান না।
 - ক. অসমস্ত মিশ্রণ কী?
 - খ. দ্রবণীয়তা বলতে কী বুঝায়?
 - গ. ঔষধের বোতল আদিলের মা কেন ঝাঁকিয়ে নেন ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. মিশ্রণ দুটি কি একই? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

আলোর ঘটনা

আলো ছাড়া আমরা দেখতে পাই না। আলো না থাকলে গাছপালা জন্মাত না। প্রাণীরা ধীরার পেত না। আমাদের খাদ্য ও বস্ত্র যেসব থেকে আসে তা জন্মাত না। আলো ছাড়া তাই জীবন কঁজনা করা কঠিন। আলো এক প্রকার শক্তি। আলোর কাজ করার সামর্থ্য আছে, তাই আলো শক্তি। কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয়। আলো অভ্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে থায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই দ্রুতিতে ভূমি চলতে পারলে এক সেকেন্ডে ভূমি পৃথিবীর চারদিকে সাত বারেরও বেশি ঘূরে আসতে পারতে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। আলো আমরা যেখান থেকেই পাই না কেন সকল আলোর উৎস হলো সূর্য। প্রত্যাশা করা যায় যে-



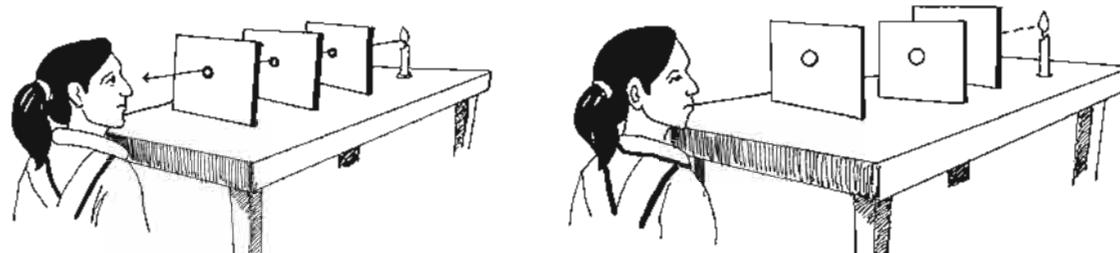
এই অধ্যায় শেষে আমরা

- আলোর সঞ্চালন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন্ধ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিফলন ও শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মসৃণ ও অমসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের চারপাশে সংষ্টিত বিভিন্ন ঘটনায় আলোর প্রতিফলনের ব্যাখ্যা দিতে পারব।

পাঠ ১-২ : আলো কীভাবে চলে

আমরা জানি যে, আলো অত্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু এ আলো কীভাবে চলে? সোজা পথে, না বাঁকা পথে? এসো আমরা কিছু কাজ করি। এগুলো থেকে বুঝতে পারব আলো কীভাবে চলে?

কাজ : তোমার নেটুবুকের তিনটি সমান কভার নাও। এদের একটার উপর আরেকটা রাখ, যাতে এদের সকল প্রাণ্য একসাথে মিলে থাকে। এখন একটি পেরেক বা মোটা সুই দিয়ে তিনটিকে একসাথে ছিন্ন কর। এবার বোর্ড তিনটি টেবিলের উপর এমনভাবে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দাও যেন তিনটি বোর্ডের ছিন্ন একই সরলরেখায় থাকে। (আঠা বা এঁটেল মাটি বা দুই বইয়ের ফাঁকে দাঁড় করাতে পার)। এখন একটি মোমবাতি ছালিয়ে বোর্ডগুলোর পেছনে এমনভাবে টেবিলের উপর বসাও যাতে মোমবাতির পুরো শিখাটির উচ্চতা বোর্ডের ছিন্নগুলোর উচ্চতার সমান হয় (চিত্র ৯:১)। বোর্ডগুলোকে এমনভাবে সজাও যেন বোর্ডের ছিন্ন ও মোমবাতির শিখা একই সরলরেখায় থাকে। এবার বোর্ডের বিপরীত দিক থেকে মোমবাতির দিকে তাকাও, মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাবে। একটি বোর্ডকে এক পাশে সামান্য সরিয়ে নাও, যাতে তিনটি ছিন্ন একই রেখায় না থাকে। মোমবাতির শিখাটি দেখতে পারছ কি? না, এখন আর শিখাটি দেখা যাচ্ছে না। আলো বাঁকা পথে তোমার চোখে প্রবেশ করতে পারেনি। এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নেবে? আলো বাঁকা পথে চলে না, সরলরেখায় চলে। আলোর এই সরলরেখিক পথকে আলোকরণ বলে।



চিত্র ৯:১ : আলো সরল রেখায় চলে

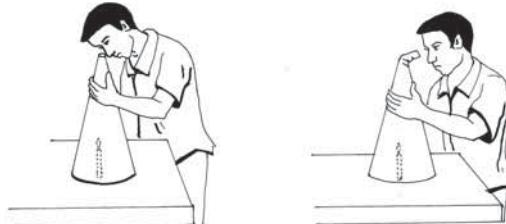
কাজ : আলো কীভাবে চলে তা জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি লম্বা কালো কাগজ, কিছু আঠা বা ক্ষচটেপ ও একটি মোমবাতি

পরিপূর্ণ কাজ : কালো কাগজটি মুড়িয়ে আঠা বা ক্ষচটেপ দিয়ে লাগিয়ে একটি নল তৈরি করো। একটি জলঙ্গ মোমবাতি নাও এবং এটাকে এমনভাবে ঢেকে রাখ যাতে একদিক দিয়ে আলো বেরুতে পারে। নলের ডিতর দিয়ে তাকাও, আলো দেখতে পাবে। এবার নলের সামনের যাথাটা নিচের দিকে বাঁকিরে নিয়ে আলোটি দেখ (চিত্র: ৯:২)। আলো দেখা যাচ্ছে কি? না। কিন্তু কেন?

কারণ, আলো সরলরেখায় চলে, বাঁকা পথে যেতে পারে না।

কাজটি সম্পন্ন করার জন্য কাগজের নলের পরিবর্তে পেঁপে গাছের ডাল ব্যবহার করতে পার।



চিত্র: ৯.২ : আলো সরল রেখায় চলে

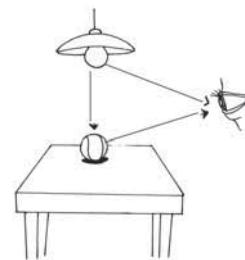
পাঠ-৩ : আমরা কীভাবে দেখি

রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে আমরা কোনো কিছু দেখতে পাই না কেন?

কোনো বস্তুকে আমরা কী করে দেখি? আমরা তখনই কোনো বস্তুকে দেখি, যখন ঐ বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। নিচে চিত্রটি লক্ষ কর (চিত্র ৯:৩)। এখানে রয়েছে একটি জ্বলন্ত বাল্ব ও একটি ক্রিকেট বল। বাল্ব থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ছে বলে আমরা বাল্বটি দেখতে পাচ্ছি। বাল্ব থেকে আলো গিয়ে ক্রিকেট বলে পড়ছে, বল থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে তাই বলটি আমরা দেখছি। আলো যখন কোনো বস্তুতে পড়ে তা থেকে বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তখন তাকে প্রতিফলন বলে। কোনো কোনো বস্তুর নিজের আলো আছে যেমন : সূর্য, তারা, জোনাকি পোকা, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাল্ব ইত্যাদি। এদের বলা হয় উজ্জ্বল বস্তু।

কোনো কোনো বস্তুর নিজের কোনো আলো নেই, অন্য বস্তুর আলো প্রতিফলিত করে, এদের বলা হয় অনুজ্জ্বল বস্তু। কোনো কোনো বস্তুতে আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয় না, বস্তুটি সমস্ত আলো শোষণ করে নেয়। এসব বস্তু তাই দেখতে কালো দেখায়।
এটা জানো কি?

চোখ থেকে আলো গিয়ে বস্তুতে পড়ে না, বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে বলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।

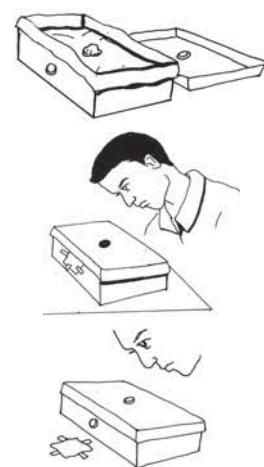


চিত্র ৯.৩ : আমরা যেভাবে দেখি

কাজ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি তা জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি কাঠের বাল্ব বা জুতার বাল্ব, একটি নুড়ি পাথর ও কিছু কালো কাগজ

পদ্ধতি : ঢাকনাসহ একটি জুতার বাল্ব নাও। কালো কাগজ দিয়ে বাস্তুর ভিতরটা মুড়ে দাও। ঢাকনার উপর একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র কর এবং একগাশের দেয়ালে একটি বড় ছিদ্র কর। নুড়ি পাথরটি ঢাকনার ছিদ্রটির ঠিক নিচে রাখ। ঢাকনাটি বন্ধ করে দাও। বাস্তুর পাশের দেয়ালের বড় ছিদ্রটি একটি মোটা কালো কাগজ বা টেপ দিয়ে ঢেকে দাও। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে নুড়িটি দেখার চেষ্টা কর। নুড়িটি দেখতে পাচ্ছ কি? না, দেখা যাচ্ছে না। বাস্তুর পাশের দেয়ালের বড় ছিদ্রটির কালো কাগজ বা টেপ সরিয়ে নাও। এই ছিদ্র দিয়ে বাস্তু আলো প্রবেশ করবে। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে আবার নুড়িটি দেখার চেষ্টা কর। নুড়িটি দেখা যাচ্ছ কি? হাঁ, দেখা যাচ্ছে।



চিত্র ৯.৪ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি

এ থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি? আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যাব না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে ফিরে আসলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। অঙ্ক লোকেরা দেখতে পান না কেন? কোনো বস্তু থেকে আলো এসে যখন স্বাভাবিক চোখে পড়ে, তখনই বস্তুটি দেখা যাব। অঙ্কদের চোখ স্বাভাবিক নয়, তাই বস্তু থেকে আসা আলো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা দেখতে পান না।

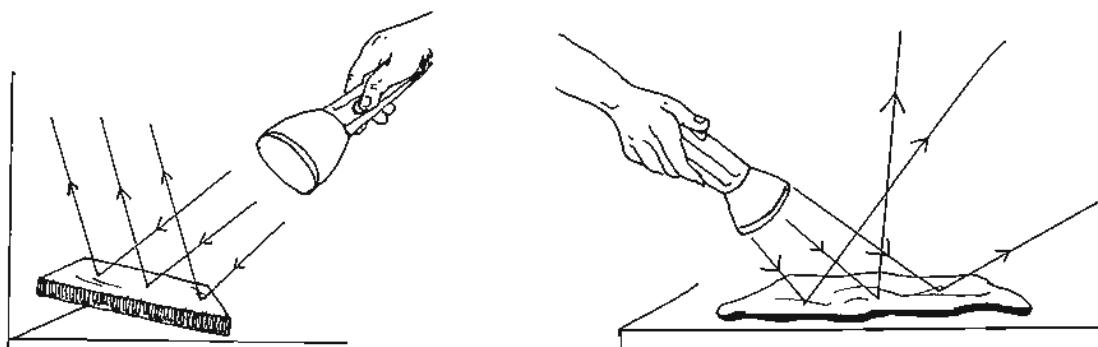
এই পৃষ্ঠায় ছাপা লেখাগুলো আমরা কী করে দেখতে পাই। কালো লেখা বা কোনো কালো বস্তু কোনো উৎস থেকে আসা আলো বেশি শোষণ করে। কিন্তু সাদা পৃষ্ঠা থেকে প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখ গ্রহণ করে। ফলে কাগজে ছাপা কালো অঙ্কগুলো আমরা দেখতে পাই। উজ্জ্বল রং অনুজ্জ্বল রংগের চেয়ে বেশি আলো শোষণ করে। যে বস্তু সকল আলো শোষণ করে তা কালো দেখায়।

পাঠ ৪-৫ : আলোর প্রতিফলন ও শোষণ

কোনো বস্তুতে আলো পড়ে যদি তা বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তা হলে তাকে প্রতিফলন বলে। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে তা হলে তাকে শোষণ বলে।

নিচের ছবি দুটি লক্ষ কর, প্রথম ছবিটি মসৃণ তলে (আয়না বা স্টিলের থালা), দ্বিতীয় ছবিটি অমসৃণ তলে (অনেক দিন ব্যবহার করা স্টিলের থালা বা কাগজের পাতা)। দুটি ছবি কী?

প্রথম ছবিটি আয়না বা দর্পণ থেকে নিয়মিত প্রতিফলন। এখানে আলো এসে যে কোণে পড়ছে, ঠিক সে কোণেই ফিরে যাচ্ছে। কোনো পৃষ্ঠে আলোর এই পড়া বা পতনকে বলা হয় আপতন এবং পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে ফিরে যাওয়াকে বলা হয় প্রতিফলন। এখানে আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান। আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরম্পর সমান্তরাল এবং প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলোও পরম্পর সমান্তরাল। দ্বিতীয় ছবিটিতে আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরম্পর সমান্তরাল কিন্তু প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলো পরম্পর সমান্তরাল নয়। এই খরনের প্রতিফলনকে বলা হয় অনিয়মিত বা বিক্ষিক্ষণ বা ব্যাপ্ত প্রতিফলন।



চিত্র : ৯.৫ আলোর প্রতিফলন

কাজ : বিভিন্ন পদার্থে বা পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের ভিন্নতা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি আয়না বা দর্পণ, এক খন্তি কাঠ, এক পাতা কাগজ, একটি স্টিলের ও একটি প্লাস্টিকের খালা।

পরীক্ষা : একটি সাদা দেয়ালের উল্টা দিকে প্রথমে দর্পণটি খাড়া করে ধরে। এখন টর্চলাইট থেকে আয়নার উপর আলো ফেলো। দর্পণে প্রতিফলিত আলো দেয়ালে পড়বে। দেয়ালে পড়া এই আলো উজ্জ্বল না অনুজ্জ্বল তা খেয়াল কর। এবার কাগজের পাতা, কাঠখন্তি, স্টিলের ও প্লাস্টিকের খালার উপর একইভাবে টর্চের আলো ফেলো এবং প্রতিবার দেয়ালে আলোর প্রতিফলন দেখ। কী দেখলে? কোনটিতে প্রতিফলিত আলো বেশি উজ্জ্বল। দেখতে পাবে যে, দর্পণ ও স্টিলের খালা থেকে আলোর প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। কাঠের টুকরা, কাগজ ও প্লাস্টিকের খালা থেকে আলোর প্রতিফলন অনেক কম এবং প্রতিফলিত আলো কম উজ্জ্বল।

সুতরাং, যে পৃষ্ঠ যত অসূণ বা চকচকে তা তত বেশি আলো প্রতিফলিত করে। আর যে পৃষ্ঠ যত অমসূণ বা কম চকচকে তা তত কম আলো প্রতিফলিত করে। অমসূণ বা কম চকচকে পৃষ্ঠ আলোর প্রতিফলনের সাথে বিক্ষেপণও ঘটে।

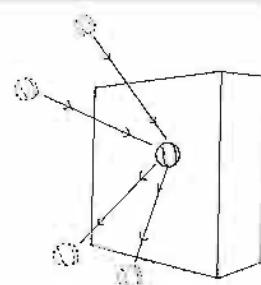
পাঠ ৬-৭ : দর্পণে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম

দর্পণে আলোর প্রতিফলনের ঘটনা অনেকটা কোনো দেয়ালে বল ছুড়ে মারলে তা দেয়াল থেকে যেভাবে বাঁউল করে ফিরে আসে তার মতো। কোনো বলকে তুমি যদি সোজাভাবে দেয়ালে ছুড়ে দাও, তাহলে তা দেয়ালে সেগে সোজাভাবেই ফিরে আসবে। দর্পণে আলো পড়ার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটবে। এবার নিচের কাজটি করো।

কাজ : দেয়ালে ছোড়া বলের দিক পরিবর্তন

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি টেনিস বল

পরীক্ষা : একটি টেনিস বল নাও। এটাকে সোজাভাবে দেয়ালে ছুড়ে মারো। দেয়ালে আঘাত করে বলটি কীভাবে ফিরে আসছে? সোজাসুজি না অন্য কোন পথে? এবার বলটি দেয়ালের সাথে কোণ করে ছুড়ে দাও। বলটি এবার কীভাবে ফিরে আসছে? সোজাসুজি না কোণ করে? বলটিকে দেয়ালের সাথে বিভিন্ন কোণ করে ছুড়ে দেখ, বলটি কীভাবে ফিরে আসছে?



চিত্র ৯.৬ : বলের দিক পরিবর্তন

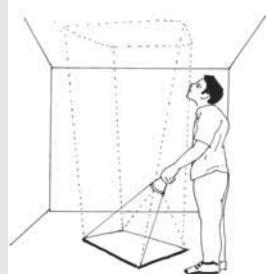
এ কাজ থেকে আমরা যা পাই তাহলো-

- ১। বলটি সোজা ছুড়লে এটা সোজা ফিরে আসে।
 - ২। বলটি দেয়ালের সাথে কোণ করে ছুড়লে এটা কোণ করে ফিরে যায়।
 - ৩। বলটিকে যে কোণে ছোড়া হয় এটা সে কোণেই ফিরে যায়।
- একই রকম ঘটনা ঘটে আলো যখন কোনো দর্পণে আপত্তি ও প্রতিফলিত হয়। নিচের কাজটি করলে এটা বুঝতে সহজ হবে।

কাজ : দর্পণে আলোর প্রতিফলন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি দর্পণ ও একটি টর্চ।

পদ্ধতি : দর্পণটি ঘরের মেঝেতে এমনভাবে রাখ যাতে এর মুখ বা মসৃণ দিকটি উপরের দিকে থাকে। দর্পণে টর্চের আলো সোজা করে ফেলো। টর্চের আলো দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সোজা গিয়ে ছাদে পড়বে। টর্চটি একদিকে সরাও যাতে টর্চের আলো কোণ করে দর্পণে পড়ে। দেখবে কোণ পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাদে পড়া আলো স্থান পরিবর্তন করছে।



চিত্র ৯.৭ : আলোর প্রতিফলন

আলো যে কোণে দর্পণে পড়ে তাকে বলা হয় আপতন কোণ। আর যে কোণে দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয় তাকে বলে প্রতিফলন কোণ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান অর্থাৎ,

$$\text{আপতন কোণ} = \text{প্রতিফলন কোণ}$$

পাঠ- ৮ : দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ম

আমরা জানি যে, কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লে আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। কিন্তু কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে কোনো মসৃণ বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে ঐ পৃষ্ঠে বস্তুটির প্রতিবিষ্ম সৃষ্টি হয়। কোনো দর্পণ বা আয়না ও স্থির পানি এর পরিচিত উদাহরণ। আমরা যদি কোনো দর্পণের সামনে দাঁড়াই তাহলে আমাদের প্রতিবিষ্ম দেখতে পাই।

একটি বড় দর্পণের (ড্রেসিংটেবিলের আয়না হতে পারে) সামনে দাঁড়াও। দর্পণে তোমার প্রতিবিষ্ম দেখতে পাবে। এবার বল-

দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্মটি কি তোমার সমান না তোমার চেয়ে বড়, না তোমার চেয়ে ছোট?

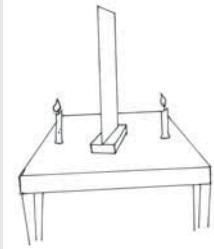
দর্পণের পেছনে সৃষ্টি প্রতিবিষ্মের দূরত্ব কি তুমি দর্পণ থেকে যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছ তার সমান? না বেশি বা কম?

- দর্পণের দিকে এক পা এগিয়ে যাও। প্রতিবিষ্মটি সম্পরিমাণ দূরত্বে সামনে এগিয়ে এসেছে, না পিছিয়ে গেছে? নাকি একই জায়গায় স্থির আছে?
- এবার তোমার ডান হাত নাড়াও। প্রতিবিষ্মটি কি হাত নাড়াচ্ছে? নাড়ালে কোন হাত নাড়াচ্ছে, ডান হাত না বাঁহাত?
- এসব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

কাজ : দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিম্বের দূরত্ব

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বড় স্বচ্ছ কাচ ও দুটি মোমবাতি।

পদ্ধতি : কাচটিকে টেবিলের উপর এমনভাবে সোজা করে দাঁড়া করাও যাতে নড়াচড়া না করে। একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে কাচের সামনে টেবিলের উপর রাখ। কাচে জ্বলন্ত মোমবাতির প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। দ্বিতীয় মোমবাতিটি কাচের পেছনে এমনভাবে দাঁড়া করাও যাতে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাটি দ্বিতীয় মোমবাতির শিখার মতো মনে হয়। দেখলে মনে হবে যেন দ্বিতীয় মোমবাতিটি জ্বলছে। এবার কাচটি থেকে জ্বলন্ত মোমবাতির দূরত্ব ও দ্বিতীয় মোমবাতির দূরত্ব মাপো। দেখ দুটি দূরত্ব সমান কি না? মজার ব্যাপার হলো, দ্বিতীয় মোমবাতির জায়গায় তুমি যদি তোমার হাতের আঙুলটি ধরো তাহলে মনে হবে তোমার আঙুলটি জ্বলছে।



চিত্র ৯.৮ : প্রতিবিম্ব গঠন

এপাঠে যেসব প্রশ্ন উঠে এসেছে তার উত্তর হলো-

- ক. দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিম্ব তোমার সমান আকৃতির। সকল বস্তুর বেলায় এটা সত্য।
- খ. দর্পণ থেকে তোমার দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান।
- গ. প্রতিবিম্ব পার্শ্ব পরিবর্তন করে অর্থাৎ ডান ও বাঁদিক তাদের অবস্থান বিনিময় করে। তুমি ডান হাত নাড়ালে প্রতিবিম্ব বাঁহাত নাড়াচ্ছে বলে মনে হবে।

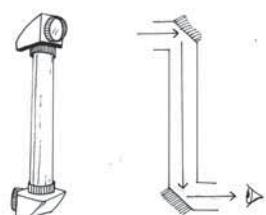
পাঠ ৯-১০ : জনপ্রিয় আলোকীয় ঘটনা

আমরা সবাই নিচের ঘটনাটির সাথে পরিচিত। আমরা সবাই সেলুনে চুল কাটাতে যাই। চুল কাটা শেষ হয়ে গেলে হেয়ার ড্রেসার বা নাপিত আমাদের পেছনে একটি আয়না (দর্পণ) ধরেন। এতে চুল কীভাবে কাটা হয়েছে তা দেখতে পারি। তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ যে, কী করে তুমি তোমার মাথার পেছন দিকটা দেখতে পাও? তোমার পেছনের দর্পণটিতে তোমার মাথার পেছনের দিকটার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবিম্ব থেকে আলো এসে তোমার সামনের আয়নায় পড়ে ফলে সেখানে পেছনের দর্পণের প্রতিবিম্বের মতো একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এটি হলো আলোর প্রতিফলন। আলোর দুবার প্রতিফলনের ফলে এরকম ঘটনা ঘটে।



চিত্র ৯.৯ : আলোকীয় ঘটনা

পেরিস্কোপ : আলোর প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে পেরিস্কোপ তৈরি হয়। পেরিস্কোপ তৈরিতে দুটি সমতল দর্পণ প্রয়োজন। আলো এসে প্রথম দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় দর্পণে পড়ে। দ্বিতীয় দর্পণ থেকে আলো যখন প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে, তখন যে বস্তুটি সরাসরি দেখা যায় না তা আমরা দেখতে পাই।



চিত্র ৯.১০ : পেরিস্কোপ

পেরিস্কোপ তৈরি হয় একটি লম্বা সরু টিউবের দুই প্রান্তে সমতল দর্পণের (আয়না) দুটি ফালি বা স্ট্রিপ স্থাপন করে। দর্পণ দুটিকে টিউবের দেয়ালের সাথে 45° কোণে স্থাপন করা হয় (চিত্র ৯.৬)। এরা পরস্পরের সাথে সমান্তরাল থাকে এবং 90° কোণে আলোর বিসরণ ঘটায় বা বাঁকিয়ে দেয়। স্টেডিয়ামে ভিড়ের মধ্যে খেলা দেখার জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বাঙ্কারে ওতপেতে থাকা সৈন্যরা ভূমিতে কী আছে তা দেখার এবং সমুদ্র পৃষ্ঠে কী আছে তা ডুবোজাহাজ থেকে দেখার জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহার করে। তোমরা বাড়িতে অতি সহজে একটি পেরিস্কোপ তৈরি করতে পার।

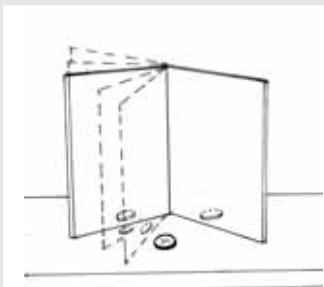
বহুমুখী প্রতিফলন

আমরা জানি যে, একটি সমতল দর্পণ বা আয়না শুধু একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। যদি দুটি সমতল দর্পণকে পাশাপাশি মুখোমুখি রাখা হয় তা হলে কী ঘটবে?

কাজ : বহুমুখী প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : দুটি সমতল দর্পণ ও কিছু আঠায়ুক্ত টেপ।

পদ্ধতি : দর্পণ দুটিকে পরস্পরের সাথে সমকোণ করে মুখোমুখি দাঁড়া করিয়ে টেপ দিয়ে আটকে দাও। দর্পণ দুটির মাঝে একটি এক টাকার কয়েন বা ধাতব মুদ্রা রাখো। দুটি দর্পণে তুমি কয়টি প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছ? এবার দর্পণ দুটিকে পরস্পরের সাথে 45° , 60° , 120° ও 180° ডিগ্রি কোণে স্থাপন কর। দেখ, প্রতি ক্ষেত্রে কতটি প্রতিবিম্ব তৈরি হচ্ছে। সবশেষে দর্পণ দুটিকে পরস্পরের সাথে সমান্তরাল করে মুখোমুখি দাঁড়া করিয়ে দাও। এদের মাঝে একটি জলস্ত মোমবাতি রাখ। দেখ কয়টি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র ৯.১১ : বহুমুখী প্রতিফলন

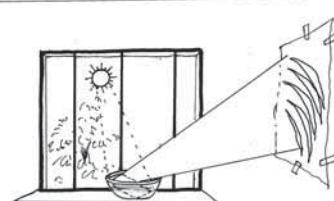
পাঠ- ১১ : প্রতিফলন ও সূর্যের আলোর রং

বিক্ষিণ্প প্রতিফলন আলোকে বিভিন্ন রঙে বিভক্ত করে। সূর্যের আলোর রং বের করতে আমরা নিচের কাজটি করব।

কাজ : প্রতিফলন ও সূর্যের রং।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি সমতল দর্পণ, একটি বাতি ও কিছু পরিমাণ পানি।

পদ্ধতি : সমতল দর্পণটিকে চিত্রের মতো করে বাটিতে রাখ। এরপর বাটিটি পানি দ্বারা পূর্ণ কর। পুরো ব্যবস্থাটিকে জানালার পাশে এমনভাবে রাখো যেন এতে সূর্যকিরণ সরাসরি পড়ে। বাটির অবস্থান এমনভাবে সমন্বয় কর যেন দর্পণ থেকে প্রতিফলিত আলো দেয়ালে গিয়ে পড়ে। দেয়ালটি যদি সাদা না হয় তাহলে এতে একটি বড় সাদা কাগজ আটকে দাও। দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে যে আলো দেয়ালে পড়ে, তাতে অনেক রং দেখা যাবে। দেয়ালে কী কী রং তুমি দেখতে পাচ্ছ?



চিত্র ৯.১২ : সূর্যের রং

এর ব্যাখ্যা কী?

এটার ব্যাখ্যা হলো, এখানে দর্পণ ও পানির সমন্বয় এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এটি যেন একটি প্রিজম তৈরি করেছে। আলোর এই বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সূর্যের আলোকে বিভিন্ন রঙে বিভক্ত করেছে। এ ঘটনাকে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ। রংধনু আলোর বিক্ষেপণের একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। সূর্য উঠা ও সূর্য ডোবার সময় তোমরা আকাশে লাল রং দেখতে পাও, তাও আলোর বিক্ষেপণের জন্যই হয়ে থাকে।

এ অধ্যায়ে শেখা নতুন শব্দ

দর্পণ, সমতল দর্পণ, প্রতিফলন, শোষণ, নিয়মিত প্রতিফলন, বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন, বিক্ষেপণ, প্রতিবিষ্ফেচ, প্রিজম, আপতন কোণ, প্রতিফলন কোণ।

এ অধ্যায়ে যা যা শিখেছি

- আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে ফিরে আসলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।
- আলো সরল রেখায় চলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তা হলে তাকে প্রতিফলন বলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে, তা হলে তাকে শোষণ বলে।
- আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।
- সকল পৃষ্ঠ থেকেই আলো প্রতিফলিত হয়।
- মসৃণ ও পালিশ করা পৃষ্ঠ থেকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।
- দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফেচ বস্তুর সমান আকৃতির হয়।
- সমতল দর্পণে সৃষ্টি প্রতিবিষ্ফেচের পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে।
- দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিষ্ফেচের দূরত্ব সমান।
- দুটি সমতল দর্পণকে মুখোমুখি রাখলে বহুমুখী প্রতিফলন ঘটে।
- সূর্যের সাদা আলো সাত রঙের সমষ্টি।
- আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সূর্যের আলোকে বিভিন্ন রঙে বিভক্ত করে। এ ঘটনাকে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ।
- রংধনু আলোর বিক্ষেপণের একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

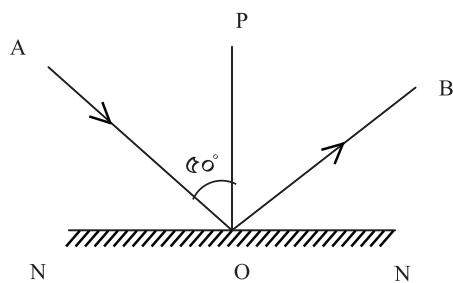
অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

- ১। সমতল দর্পণে আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ -----।
- ২। সূর্যের আলোর বিভিন্ন রঙে বিভক্তির কারণ হলো আলোর -----।
- ৩। কোনো ব্যক্তি দর্পণ থেকে ১ মিটার দূরত্বে দাঁড়ালে তার প্রতিবিষ্ফেচ থেকে তার দূরত্ব -----মিটার হবে।
- ৪। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার ডান কান ছুলে প্রতিবিষ্ফেচ ----- ছুঁবে।
- ৫। পেরিস্কোপ তৈরি হয় প্রতিফলনের -----ঘটার জন্য।

ବହୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ :

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। মনে কর তুমি একটি অন্ধকার ঘরে আছ। তুমি কি ঘরের ভিতরের জিনিস দেখতে পাবে? তুমি কি ঘরের বাইরের জিনিস দেখতে পাবে? ব্যাখ্যা কর।

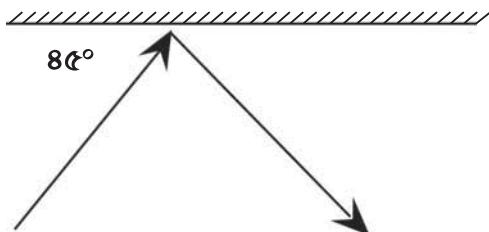
২। নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের পার্থক্য কী?

৩। একটি পেরিস্কোপের গঠন বর্ণনা কর।

৪। নিচের কোনটি থেকে নিয়মিত ও কোনটি থেকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে?

(ক) মার্বেলের মেঝে	(খ) ছড়ানো আটা
(গ) জুতার বাক্স	(ঘ) সমতল দর্পণ
(ঙ) পালিশ করা দরজা	(চ) নতুন স্টিলের থালা

৫। নিচের চিত্রটি দেখ এবং কোণগুলোর মান বের কর।

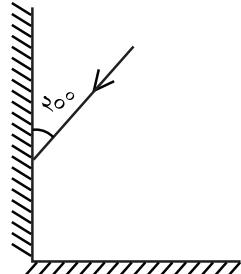


সূজনশীল প্রশ্ন :

১. সামিন স্কুলের ব্যবহারিক ক্লাসে পেরিস্কোপ নিয়ে এর মধ্যে তাকাতেই ক্লাসের বাইরে অবস্থিত বাগানের ফুল লক্ষ করল। ক্লাসের শেষে হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের আয়নার সামনে যেতেই লক্ষ করল সে যত সামনে আসছে আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও তত সামনে এগিয়ে আসছে, আবার দূরে যাওয়ার সময় আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও দূরে সরে যাচ্ছে। এরপর বাসায় ফিরে সে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে 30° কোণে দর্পণ স্থাপন করে একটি পেরিস্কোপ তৈরি করল।

- (ক) আলোর প্রতিফলন কাকে বলে?
- (খ) আলোর বিক্ষেপণ বলতে কী বুঝায়?
- (গ) আয়নায় সামিনের প্রতিচ্ছবি পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) সামিনের বাসায় প্রস্তুতকৃত পেরিস্কোপ দিয়ে স্কুলের অনুরূপ বাইরের দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে কি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

১। দুটি সমতল দর্পণ সমকোণে মিলিত হয়েছে। একটি আলোক রশ্মি 20° কোণে প্রথম দর্পণে পড়েছে



- (ক) প্রতিফলন কাকে বলে?
- (খ) বহুমুখী প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর।
- (গ) দ্঵িতীয় দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মিটি আঁকো।
- (ঘ) দর্পণ দুটিকে পরস্পরের সমান্তরাল করা হলে কোন ধরনের প্রতিফলন ঘটবে এবং কেন ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

নিজেরা কর

- ১। প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে একটি পেরিস্কোপ তৈরি কর।
- ২। নিজের আয়না বা দর্পণ নিজে তৈরি কর। এক ফালি কাচ নাও। একে ভালো করে পরিষ্কার কর। একে এক পাতা সাদা কাগজের উপর রাখ এবং কাচে নিজেকে দেখ। কতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে? এরপর কাচটিকে এক পাতা কালো কাগজের উপর রাখ এবং কাচে নিজেকে দেখ। এখন কি তুমি নিজেকে আরও ভালো ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ এবং কেন?

দশম অধ্যায়

এসো গতিকে জানি

ছিতি ও গতি আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়। এ বিষে কোনো বস্তু ছির আবার কোনো বস্তু গতিশীল। প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে নানান রকম ছিতি ও গতি দেখতে পাই। বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, রাস্তার ল্যাম্প পোস্ট, রাস্তার পাশে গাছ সব সময়ই দাঁড়িয়ে আছে—এরা ছিতিতে আছে বা ছির। চলমান বাস, চলস্ত গাড়ি, চলস্ত রিক্সা, চলস্ত ট্রেল এবলকি আমাদের হাঁটা-চলা হলো গতির উদাহরণ। এ অধ্যায়ে আমরা ছিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় থেকে আমরা

- ছিতি ও গতির পার্শ্বক্য করতে পারব।
- সকল গতিই আপেক্ষিক তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন ধর্কার গতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- দূরত্ব ও দ্রুতি নির্ণয় করতে পারব।
- দ্রুত পরিমাপে স্টেপ-ওয়াচ (থায়-ঘড়ি) সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারব।
- অতিরিক্ত গতি কীভাবে জীবনের জন্য ঝুঁকি বয়ে আনে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালীন নিরাপত্তাব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালে সাঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এহে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ-১

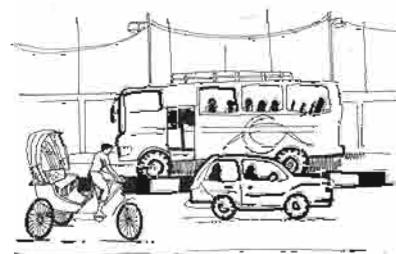
ছিতি ও গতি

আমাদের চারপাশে নানান রকম বস্তু রয়েছে। এদের অনেকে ছির বা ছিতিতে রয়েছে, যেমন : ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, গাছ, রাস্তার পাশের ল্যাম্প-পোস্ট ইত্যাদি। এরা এক জায়গায় ছির দাঁড়িয়ে আছে।



চিত্র ১০.১ : ছির অবস্থা

আবার অনেক বস্তু আছে বা চলমান বা এদের গতি আছে। যেমন : চলমান ট্রেল, চলস্ত বাস ও গাড়ি, চলমান সাইকেল ও রিক্সা, হেঁটে চলা লোক ইত্যাদি।



চিত্র ১০.২ : গতিশীল অবস্থা

এবার আসা যাক আমরা স্থিতি ও গতি বলতে কী বুঝি?

মনে কর, আনুশেহ রাস্তার এক পাশে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আনুশেহ বলছে, রাস্তার পাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট ও বাসস্টপ সবই স্থির রয়েছে। সে কেন এ কথা বলছে? বলতে পারবে?

আনুশেহ এ কথা বলছে কারণ এসব বস্তু তার সাপেক্ষে সময়ের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করছে না। তাই কোনো বস্তু যদি সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে তা হলে তা স্থির এবং বস্তুর ঐ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।

কাজ : হাত দিয়ে একটি কলম ধরে রাখ। কলমের আশেপাশে কী আছে? আশেপাশের বস্তুগুলোর তুলনায় কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি? না। তোমার হাতে ধরে থাকা কলমের আশেপাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন : তোমার চেয়ার, টেবিল, তোমার বই, খাতা ও ঘরের সবকিছু থেকে এই কলমের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ও দিক আছে। কলমের আশেপাশের সকল বস্তুর তুলনায় কলমটির অবস্থান নির্দিষ্ট। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা বলি, পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি স্থির। কলমটির স্থির থাকার এই ঘটনাই হচ্ছে স্থিতি।

সুতরাং, সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন না করা হলো স্থিতি।

এবার আরেকটি ঘটনা ধরা যাক। আরিয়ান একটি রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। তার সামনে দিয়ে একটা ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করে চলে গেল। তা দেখে সে বলল যে, ট্রেনটি গতিশীল। কারণ তার সাপেক্ষে ট্রেনটির অবস্থান প্রতিক্রিয়েই পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ আরিয়ানের সাপেক্ষে ট্রেনটি প্রতিক্রিয়েই অবস্থান পরিবর্তন করছে।

কাজ : তোমার হাতে ধরা কলমটিকে এদিক-সেদিক নাড়তে থাকো। আশেপাশের সকল বস্তুর তুলনায় কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে কি? হ্যাঁ, ঘটছে। কলমের আশেপাশের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে কলমের দূরত্ব ও দিক ত্রুটাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বলি পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি গতিশীল।

সুতরাং, কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি। আমাদের চারপাশে এমন অনেক গতির উদাহরণ হলো, চলমান বাস, কোনো ব্যক্তির দৌড়ে চলা, পাখি উড়ে যাওয়া, ফুটবল গাঢ়িয়ে যাওয়া, গাছ থেকে ফল পড়া। তোমাও এরকম গতির অনেক উদাহরণ দিতে পারবে। বল তো এরকম আর কী কী বস্তুর গতি আছে?

পাঠ-২ : স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক

কোনো বস্তু এক পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে স্থির থাকলেও একই সঙ্গে অন্য পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল হতে পারে। একটি ঘটনা বিবেচনা করা যাক, আরিয়ান বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসে বসে থাকা একজন যাত্রী বাসের গতিতে তাকে অতিক্রম করে গেল। আরিয়ানের তুলনায় বা সাপেক্ষে বাস ও বাসের যাত্রী গতিশীল। কিন্তু বাসস্টপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি তার সাপেক্ষে স্থির। কিন্তু বাসের যাত্রীর নিকট মনে হচ্ছে যে গাছটি তার সাপেক্ষে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ বাসস্টপের গাছটি বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। আবিয়ান যদি এ বাসের যাত্রী হতো তাহলে সে দেখতে পেত যে তার সাপেক্ষে এ যাত্রীটি স্থির, কিন্তু বাসস্টপের গাছটি তার সাপেক্ষে পিছনের দিকে গতিশীল। একই গাছ আরিয়ানের সাপেক্ষে স্থির কিন্তু বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই পরম স্থিতি বা পরম গতিতে থাকতে পারে না। স্থিতি বা গতি কথা দুইটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক এবং নির্ভর করে কে পর্যবেক্ষক তার উপর। কোনো বস্তু কোনো পর্যবেক্ষকের তুলনায় গতিশীল হলেও অন্য পর্যবেক্ষকের তুলনায় স্থির থাকতে পারে। সুতরাং স্থিতি বা গতি পরিমাপের আগে ঠিক করে নিতে হবে কার সাপেক্ষে স্থিতি বা গতি পরিমাপ করা হবে।

কাজ : একটি সাইকেল নিয়ে তিনি বন্ধু মাঠে যাও। এক বন্ধুকে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে বল। তুমি সাইকেলের পেছনের সিটে বস এবং অপর বন্ধুকে সাইকেলটি সোজা চালাতে বলো। তোমরা সাইকেলে চড়া দুই বন্ধু স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে প্রতিক্ষণেই অবস্থান পরিবর্তন করছ অর্থাৎ স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে তোমরা গতিশীল। কিন্তু তোমার পাশে বসে সাইকেল চালানো বন্ধুটি কি তোমার সাপেক্ষে গতিশীল? অবশ্যই নয়। সুতরাং সকল গতিই আপেক্ষিক।

প্রসঙ্গ-কাঠামো

যে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতি বা স্থিতি পরিমাপ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রসঙ্গ-কাঠামো। সুতরাং, প্রসঙ্গ-কাঠামো হলো এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দু, যার সাপেক্ষে বস্তুর স্থিতি বা গতি নির্ণয় করা হয়। প্রসঙ্গ-কাঠামো হতে পারে যেকোনো ব্যক্তি, যেকোনো বস্তু, যেকোনো স্থান। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এদের সুনির্দিষ্ট হতে হবে। তুমি যদি তোমার বাড়ি থেকে তোমার স্কুলের দূরত্ব মাপতে চাও, এক্ষেত্রে তোমার বাড়ি হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব জানতে চাইলে পৃথিবী হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো।

➤ এটা জান কি?

সমগ্র বিশ্বজগৎ গতিশীল। মনে কর, তুমি তোমার বিছানায় শুয়ে আছ। তুমি অবশ্যই বলবে যে, তুমি তুমির সাপেক্ষে স্থির আছ বা স্থিতিতে আছ। কিন্তু পৃথিবী নিজেই তার অক্ষের চারদিকে ঘূরছে। সুতরাং পৃথিবীর সাথে তুমি গতিতে আছ বা গতিশীল।

পাঠ ৩-৪ : নানান প্রকার গতি

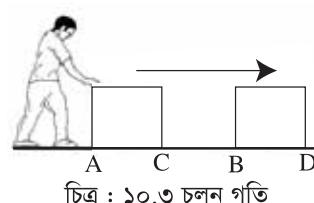
গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। এরা হলো :

(ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যা঵ৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দনগতি বা দোলনগতি

চলন গতি

মনে কর, একটা বাক্স কাঠের মেঝের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুরো বাক্স A থেকে B তে সরে গেছে এবং বাক্সের উপরকার C বিন্দু চলে গেছে D বিন্দুর উপর।

এর সকল বিন্দু একই মাপ বরাবর একই দূরত্ব CD পরিমাণ সরে গেছে। এটি হলো চলমান গতির উদাহরণ।

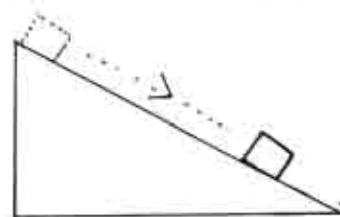


চিত্র : ১০.৩ চলন গতি

সুতরাং, চলন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু এমনভাবে চলে যে এর সকল কথা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সরান দূরত্ব অতিক্রম করে। সুতরাং পৃথিবীর সাথে তুমি গতিতে আছ বা গতিশীল।

কাজ : একটি ইট সরু কর। তোমাদের শ্রেণিকক্ষের টেবিলের উপর ইটটি একটি নিমিট বিন্দু A তে রাখ। তব দিয়ে দাল দিয়ে ইটের সামনের ওপরের পাণ্ড টেবিলের উপর চিহ্নিত কর। এবার বন্দুটিকে সামনের দিকে টেবে একটি সিলিন্ড দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাও। এবার টেবিলে চিহ্নিত ইটের সামনের পাণ্ড ইটের সরুস অবস্থাদের সামনের পাণ্ড এবং শেষ পাণ্ড থেকে শেষপোন্ত পর্যন্ত মেঝে দেখ দুটি দূরত্ব সরান। এরফলে মধ্য বিন্দু থেকে মধ্য বিন্দু যাপনে দূরত্ব একই পাবে।

টেবিলের ছানারের গতি, চালু কর নিয়ে কোনো বাই শিল্পে পড়ার গতি, শেখার সময় হাতের গতি—এগুলো সবই চলনগতি। চলনগতিকে সুটি তাপে জাগ করা যাব (১) সরল গতি ও (২) বক্র গতি। বখন আমরা শিখি, তখন আমাদের হাত কখনো সোজা বা সরল রেখায় যাব আবার কখনো সরুস বক্র রেখায় যাব।



চিত্র ১০.৪ : সরল গতি

যখন কোনো বস্তু সরলজোখা বরাবর চলে, তখন একে সরল ঐতিক গতি বলে। আবার কোনো বস্তু বর্ধন বর্ধনশৈলী চলে তখন এর গতি হয় বক্রগতি।

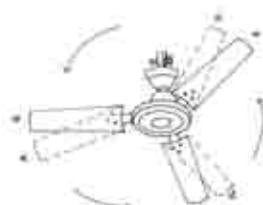


চিত্র ১০.৫ : বক্র গতি

কাজ : কোনো বন্দুকে শ্রেণিকক্ষের এক পাণ্ড থেকে অন্য পাণ্ড সোজা হেঠে যেতে বল। এটা হলো সরল ঐতিক গতি। আরেক বন্দুকে আঁকাবাঁকা পথে শ্রেণিকক্ষের এক পাণ্ড থেকে অন্য পাণ্ড যেতে বল। এটা হলো বক্রগতি।

পাঠ-৫ : ঘূর্ণন গতি

তোমার শ্রেণিকক্ষের সিলিং ফ্যানের গতি সরক কর। চিত্রটি দেখ, এখানে ঘূর্ণযান বৈদ্যুতিক পাখার ক্লেভের ঘূর্ণনের কলে ক বিন্দু ক' বিন্দুতে, এ বিন্দু $\frac{1}{2}$ বিন্দুতে এবং $\frac{1}{3}$ বিন্দু $\frac{2}{3}$ বিন্দুতে ছানাজরিত হয়েছে। পাখার সকল বিন্দু একই পথে চলেনি কিন্তু প্রতিটি বিন্দু পাখার কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ঘূর্ণার্থের বৃত্তাকার পথে চলেছে। পাখার এই গতিই হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ। বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে ঘূর্ণনগতি পর্যবেক্ষণ কর।



চিত্র ১০.৬ : ঘূর্ণন গতি

কাজ : কুলের মাঠে যাও। বাঁশের ঝুঁটিটি শক্ত করে ঘাটিকে স্পোত। এক হাত নিয়ে বাঁশটি শক্ত করে ধরে বাঁশের চারদিকে ঘূর্ণাক্তে থাকো। এই গতি হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ।



চিত্র : ১০.৭ ঘূর্ণন গতি

পাঠ-৬ : ঘূর্ণন চলনগতি

তোমরা সাইকেলের চাকার গতি লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই। সাইকেলের চাকা ঘূরতে ঘূরতে অগ্রসর হয় বা পথ চলে। এই গতির যেমন ঘূর্ণন আছে তেমন চলন আছে। এই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বা জটিল গতি বলে। গড়িয়ে যাওয়া বলের গতি, ড্রিল মেশিনের গতি হল ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।

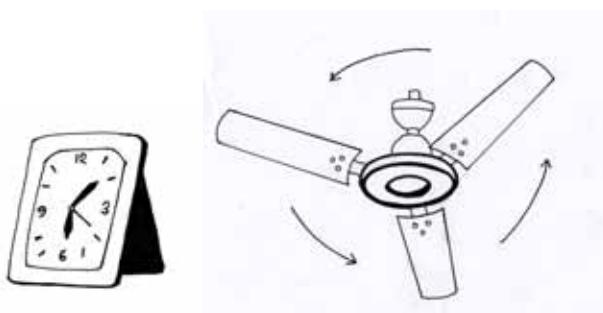
কাজ : স্কুলের মাঠে কোনো বন্ধুকে সাইকেল চালাতে বল। সাইকেল চলার সময় এর চাকার গতি লক্ষ কর এবং চাকা দুটি কী করছে? ঘূরছে। চাকা কিসের চারদিকে ঘূরছে? চাকা কোনো দূরত্ব অতিক্রম করছে কি? চাকা দুটি এদের কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘূরতে থাকে এবং প্রতিবারই কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে। এখানে ঘূর্ণন গতি ও চলনগতি একসাথে কাজ করে। এই গতি ঘূর্ণন চলনগতির উদাহরণ।

পাঠ-৭ : পর্যাবৃত্ত গতি

ঘড়ির কাঁটার গতি লক্ষ কর। সেকেন্ডের কাটাটি প্রতি এক মিনিটে একবার এর কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে ঘূরে আসে। কাঁটাটি বারবার একটি পথে ঘূরছে অর্থাৎ এর গতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ ধরনের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি।

তোমার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ের কথা মনে কর। মনে কর, তুমি মাঠের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছ। চারপাক দৌড়ের একজন প্রতিযোগী তোমাকে একই দিকে থেকে চারবার অতিক্রম করে যাবে। এটা পর্যাবৃত্ত গতি। ঘড়ির কাঁটার গতি, পাকদৌড়ের গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি। সুতরাং,

কোনো গতিশীল বস্তু যদি একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।



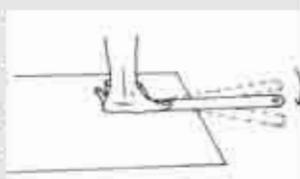
চিত্র ১০.৮ পর্যাবৃত্ত গতি

কাজ : বিদ্যুৎের মাঝে দাও। তুমি এক আয়গায় দাঁড়াও। কোথার কোনো বস্তুকে কোথার হাত ধরতে বল। অপর বস্তুকে বল কোমাদের দুইজন হকে সমন্বয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে। তুমি কোথার আয়গায় হিঁর দাঁড়িয়ে থাক এবং কোথার বস্তুকে কোথার চারপাশে দুরতে বল। কোমার হাতখনা বহু কোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বস্তুকে একই পথে বাঁচাবার অভিজ্ঞ করছে। এই গতিই হলো পর্যবৃক্ষ গতি।

এবার কোমাদের সৈন্যদিম অভিজ্ঞতা থেকে এরকম পর্যবৃক্ষ গতির উদাহরণ দাও।

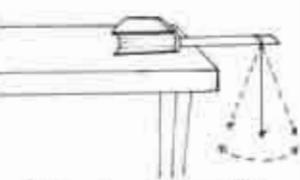
পাঠ-৮ : সোলন বা স্পন্দন গতি

কাজ : একটি প্লাটিনের রশ্মি নিয়ে একে টেবিলের এক পাতে অমনভাবে রাখ, যাতে এর বেশ কিছুটা অংশ (ধূয় অর্থে) টেবিলের বাইরে থাকে। এবার এক হাত নিয়ে টেবিলের উপরের রশ্মিরের অংশটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধর। যাতে এটি নড়ে চড়ে না যায় এবং নিমিট হাতে হিঁসে থাকে। অপর হাত নিয়ে রশ্মিগতির টেবিলের বাইরের অংশটি নিয়ে টেনে সামান্য নামিয়ে দেক্ষে দাও। তুমি কী দেখছো টেবিলের বাইরের রশ্মির অংশটি উপরে নিতে উঠানামা করছে (চিত্র) অর্থাৎ এটি একটি নিমিট অবস্থানে অবস্থান দূলছে। এই ব্যবসের গতিকে সোলন গতি বা স্পন্দন গতি বলে।



চিত্র ১০.৯ : সোলন গতি

কাজ : সূতার এক পাতে হেটি কুড়ি পাখরটিকে বেঁধে ছবির মতো করে টেবিলের এক পাতে রুলিয়ে দাও। কুড়ি পাখরটিকে এক পাশে টেনে সামান্য সূর্যে নিয়ে নিয়ে আঁকে দাও। পাখরটি ধৰ্মে যে হিঁর অবস্থানে থেকে টেনে নেয়া হয়েছিল, সে অবস্থানে কিন্তু আসবে। এরপর পাখরটি আবার হিঁর অবস্থানের বিপরীত দিকে চলে যাবে। কিন্তু সূর্যে যাবার পর আবার হিঁর অবস্থানে কিন্তে এসে যে দিকে টানা হয়েছিল সেদিকে যাবে। এজ্যাবে পাখরটি এর হিঁর অবস্থানের দুই দিকে সূলতে থাকবে। এই সোলন হলো পাখরের হিঁর অবস্থানের দুই পাশে অবস্থান গতি (চিত্র)। পাখরের এই গতিকে সোলনগতি বা স্পন্দন গতি বলে।

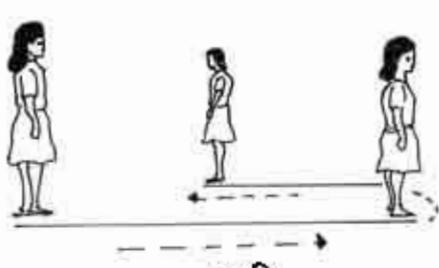


চিত্র ১০.১০ : স্পন্দন গতি

সূতার, সোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানে অবস্থান চলে বা পার্শ্বীয়। দেয়ালঘড়ির সোলনের গতি সোলন গতি।

পাঠ-৯ : সূরক্ষ ও সরুশ

মদে কুম, আনিলা কোনো নিমিট বিন্দু থেকে ১০ মিটার দূরিতে গেল। তারপর সে পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে উজ্জ্বল দিকে ৮ মিটার গেল। এখানে আনিলা সূরক্ষ অভিজ্ঞ করল (১০+৮) মিটার বা ১৮ মিটার। কিন্তু আনিলা সরুশ ঘটে যাব (১০-৮) মিটার = ৬ মিটার।



কেন? কারণ,

চিত্র ১০.৯ সূরক্ষ ও সূরক্ষ

দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা মোট দৈর্ঘ্য। এখানে তা ১৪ মিটার। আর সরণ হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রম করা সোজাসুজি দূরত্ব। যা হলো (১০-৪) মিটার = ৬ মিটার।

সুতরাং, দূরত্ব হলো যেকোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে সোজাসোজি বা সরলরেখায় অতিক্রান্ত দূরত্ব। সরণ হলো বস্তুটির অবস্থানের প্রথম স্থান থেকে বস্তুটির অবস্থানের শেষ স্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।

উদাহরণ

মিসেস রাশিদা সামনের দিকে ৭ কিলোমিটার হাঁটলেন। এরপর বাঁক নিয়ে পেছনের দিকে ৫ কিলোমিটার হাঁটলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

মিসেস রাশিদার অতিক্রান্ত দূরত্ব = মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$= ৭ \text{ কিলোমিটার} + ৫ \text{ কিলোমিটার} = ১২ \text{ কিলোমিটার}$$

মিসেস রাশিদার সরণ = সোজাপথে প্রথম থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব

$$= ৭ \text{ কিলোমিটার} - ৫ \text{ কিলোমিটার} = ২ \text{ কিলোমিটার}$$



চিত্র ১০.১০ সরণ ও দূরত্ব

সমাধান কর-১

রাশেদ সাহেব সকাল বেলা উত্তর দিকে ১০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গেলেন। এরপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে ৪ কিলোমিটার এলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

পাঠ -১০ : দ্রুতি ও বেগ

মনে কর, স্কুল ছাঁটির পর আনিলা ও নওশীন নভোথিয়াটারে গেল। দুজনেই বিকাল ৫টায় রওনা করল। আনিলা নভোথিয়াটারে পৌছাল ৫-৩০ মিনিটে আর নওশীন পৌছাল ৫-১০ মিনিটে। কে বেশি দ্রুত গেল? অবশ্যই নওশীন। কারণ নওশীন সম্পরিমাণ দূরত্ব আনিলার চেয়ে ২০ মিনিট কম সময়ে অতিক্রম করেছে।

রবিন ও শাহীন তাদের বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা করল। রবিন স্কুলে পৌছাল ২০ মিনিটে, শাহীন পৌছাল ৪০ মিনিটে। রবিনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৬০০ মিটার এবং শাহীনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ২০০০ মিটার। কে বেশি দ্রুত গেল? এখানে রবিন কম দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং শাহীন বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

কে বেশি দ্রুত গেছে তা বের করতে আমাদের বের করতে হবে যেকোনো একটি নির্দিষ্ট সময় তারা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে। মনে করা যাক, এই নির্দিষ্ট সময় ব্যবধান হলে ১ মিনিট।

$$১ \text{ মিনিটে রবিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব} = ১৬০০ / ২০ = ৮০ \text{ মিটার।}$$

$$১ \text{ মিনিটে শাহীনের অতিক্রান্ত দূরত্ব} = ২০০০ / ৪০ = ৫০ \text{ মিটার।}$$

সুতরাং, রবিন বেশি দ্রুত স্কুলে গেছে। কারণ, সে ১ মিনিটে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সুতরাং কোনো গতিশীল বস্তুর দ্রুতি হলো একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব। এটাকে এভাবেও বলা যায়,

$$\text{দ্রুতি} = \text{দূরত্ব} / \text{সময়}$$

দূরত্ব মাপা হয় মিটারে, একে সংক্ষেপে ‘মি’ দিয়ে বুঝানো হয়, সময় মাপা হয় সেকেন্ডে, একে সংক্ষেপে বুঝানো হয় সে. দিয়ে।

উদাহরণ : একটি গাড়ি ৩ সেকেন্ডে ৬০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল। এর দ্রুতি কত?

দ্রুতি = দূরত্ব / সময়

$$= 60 \text{ মি.}/ 3 \text{ সে.}$$

$$= 20 \text{ মি.}/\text{সে.}$$

সমাধান কর

নাহিয়ান কলেজের ঝীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ে ৫০০০ মিটার ২৫ মিনিটে গেল। তার দ্রুতি কত?

বেগ

কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।

মনে কর লুবাবা উভর দিকে ১০ সেকেন্ডে ১৫ মিটার গেল। তার বেগ কত হবে?

$$\text{বেগ} = 15 \text{ মিটার} / 10 \text{ সেকেন্ড}$$

$$= 1.5 \text{ মি.}/\text{সে. উভর দিকে।}$$

বেগের মান বলার সাথে দিকও উল্লেখ করতে হবে। কারণ, বেগের মান ও দিক উভয়ই আছে। কিন্তু, দ্রুতির শুধু মান আছে। স্কুলের ঝীড়া প্রতিযোগিতার পাকদৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো দ্রুতির উদাহরণ। এর কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, শুধু মান আছে। নির্দিষ্ট কোনো দিকে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো বেগের উদাহরণ।

মনে রেখ

- কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কোনো বস্তুর সরণ হলো ঐ বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের সমান।
- সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে।

পার্ট- ১১ : ত্বরণ

মনে কর, একটি মোটর সাইকেল ২০ মিটার/ সেকেন্ড বেগে চলছিল। চালক অ্যাকসিলারেটর চাপলেন ফলে মোটরসাইকেলটি আরও বেশি বেগে যেতে লাগল। মনে করা যাক, প্রতি সেকেন্ডে মোটরসাইকেলের বেগ ৫ মিটার বাঢ়ছে।

মোটরসাইকেলটির আদি বা প্রাথমিক বেগ ছিল ২০ মিটার / সেকেন্ড

১ সেকেন্ড পরে এর বেগে বেড়ে হলো ২৫ মিটার / সেকেন্ড

২ সেকেন্ড পরে এর বেগে বেড়ে হলো ৩০ মিটার / সেকেন্ড

৩ সেকেন্ড পরে এর বেগে বেড়ে হলো ৩৫ মিটার / সেকেন্ড

৪ সেকেন্ড পরে এর বেগে বেড়ে হলো ৪০ মিটার / সেকেন্ড

৫ সেকেন্ড পরে এর বেগে বেড়ে হলো ৪৫ মিটার / সেকেন্ড

প্রতি সেকেন্ড যে পরিমাণ বেগ বাঢ়ছে তা হলো ত্বরণ। এখানে প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার / সেকেন্ড বেগ বাঢ়ছে। সুতরাং ত্বরণ হলো প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার / সেকেন্ড। একে ৫ মিটার / সেকেন্ড^২ লেখা হয়।

বেগের মোট বৃদ্ধি ও মোট সময় জানা থাকলে সহজেই ত্বরণ বের করা যায়।

এখানে আদি বেগ ছিল ২০ মিটার / সেকেন্ড। শেষ বেগ ছিল ৪৫ মিটার / সেকেন্ড

সুতরাং বেগের মোট বৃদ্ধি ($45 - 20$) মিটার / সেকেন্ড = 25 মিটার / সেকেন্ড

মোট সময় লেগেছে 5 সেকেন্ড

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং, ত্বরণ} &= (\text{বেগের মোট বৃদ্ধি}) / (\text{মোট সময়}) \\ &= (25\text{মি}/\text{সে})/5\text{সে} = 5 \text{ মি}/\text{সে}^2 \end{aligned}$$

সুতরাং, ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগের বৃদ্ধির হার বা প্রতি সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি।

মন্দন :

উপরের উদাহরণে মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে 5 মি/সে বাঢ়ছিল। চালক যদি অ্যাকসিলারেটর না চেপে ত্বেক চাপতেন তাহলে মোটরসাইকেলটি ধীরগতি হয়ে যেত। এর বেগ হয়তো প্রতি সেকেন্ডে 5 মি/সে কমতে থাকত। মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ কমত তাকে বলা হয় ঝণাঝক ত্বরণ বা মন্দন। সুতরাং, মন্দন হলো ঝণাঝক ত্বরণ।

পাঠ -১২ : অতিরিক্ত গতি ও জীবনের ঝুঁকি

কাজ : $5/6$ জন বয়সু মিলে এক একটি দল তৈরি কর। প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে যানবাহনের দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে আলোচনা কর। আলোচনা শেষে কারণগুলো খাতায় লিখ। প্রতিটি দল থেকে একজন তা উপস্থাপন কর। সকল দলের উপস্থাপনের পর নিজেরা সারসংক্ষেপ তৈরি কর।

আমাদের দেশে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ দুর্ঘটনার একটি কারণ অতিদ্রুত গাড়ি চালানো। অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে যানবাহনের উপর চালকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সুতরাং, যেসব বাসচালক, ট্রাকচালক বা গাড়িচালক অতিদ্রুত গাড়ি চালান, তারাই বেশি দুর্ঘটনায় পড়েন। ফলে অনেক লোক মারা যায়। অনেক লোক আহত হয়। অনেক লোক চিরজীবনের জন্য পঞ্চু হয়ে যায়। তাই অতিরিক্ত বেগে বাস, ট্রাক, লরি, ও গাড়ি চালাতে নেই। কেউ চালালেও তাকে নিষেধ করতে হবে। সরু রাস্তা, রাস্তার বাঁক ও সেতুতে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বেশি। এসব জায়গায় অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক রাস্তায় যানবাহনের গতিসীমা নির্দিষ্ট করা থাকে। এ নির্দিষ্ট গতিসীমা মেনে যানবাহন চালাতে হবে। বড় হয়ে নিজেরা কখনো অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালাবে না এবং অন্যকেও চালাতে নিষেধ করবে।

নতুন শব্দ : স্থিতি, গতি, চলনগতি, ঘূর্ণনগতি, চলন ঘূর্ণনগতি, পর্যাবৃত্ত গতি, স্পন্দন গতি, সরণ, বেগ ও ত্বরণ

এই অধ্যায়ে যা শিখলাম

- কোন বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি।
- কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে, তখন বস্তুটিকে স্থিতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।
- সকল গতিই আপেক্ষিক।
- গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। এরা হলো- (ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দনগতি বা দোলনগতি
- কোনো গতিশীল বস্তুর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করলে তাকে চলনগতি বলে।
- কোনো বস্তুর সকল বিন্দু একই পথে না চলে এর প্রতিটি বিন্দু যদি এর কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্দের বৃত্তাকার পথে চলে তাহলে এর গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে।

- যে গতির ঘূর্ণন ও চলন উভয়ই আছে সেই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বলে।
- কোনো গতিশীল বস্তু যদি একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।
- দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের অংগপক্ষাং চলে বা গতিশীল।
- দূরত্ব হলো যেকোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা হতে শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।
- কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত অতিক্রম করে তাকে দ্রুতি বলে।
- কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।
- ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগের বৃদ্ধির হার বা প্রতি সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি।
- মন্দন হলো ঝুঁগাত্তাক ত্বরণ।
- যানবাহনের অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পুরণ কর

- ১। ঢালু জায়গা দিয়ে কোনো বস্তু পিছলে পড়ার গতিকে ----- বলে।
- ২। গড়িয়ে যাওয়া মার্বেলের গতি হলো -----।
- ৩। সাইকেলের পাম্পের হাতলের গতি হলো -----।
- ৪। সময়ের সাথে-----হারকে বেগ বলে।
- ৫। ----- মান ও দিক উভয়ই আছে।

নিচের কোনটি কোন ধরণের গতি লেখ।

- ১। চলমান বাসের চাকার গতি।
- ২। দোলনার গতি।
- ৩। সাইকেলের প্যাডেলের গতি।
- ৪। নিজ অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর গতি।
- ৫। ক্ষিপ্তি করার সময় তোমার হাতের গতি।
- ৬। আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ির গতি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সময়ের সাথে সরণের পরিবর্তনের হারকে কী বলে?

- | | |
|-----------|----------|
| ক. দ্রুতি | খ. বেগ |
| গ. দূরত্ব | ঘ. ত্বরণ |

২. ঘড়ির সেকেন্ডের কাটার গতি কোন ধরনের গতি?

- | | |
|-------------|-------------------|
| ক. চলন গতি | খ. ঘূর্ণন গতি |
| গ. দোলন গতি | ঘ. পর্যাবৃত্ত গতি |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমি একটি স্থান থেকে নির্দিষ্ট দিকে সোজাপথে ৮ মিটার গেল। সেখান থেকে একই পথে একই দিকে ৬ মিটার ফিরে এলো।

৩. রিমি কত দূরত্ব অতিক্রম করল?

ক. ২ মিটার

খ. ১০ মিটার

গ. ১৪ মিটার

ঘ. ৪৮ মিটার

৪. রিমির সরণ কত?

ক. ২ মিটার

খ. ৬ মিটার

গ. ৮ মিটার

ঘ. ১৪ মিটার

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। পর্যাবৃত্তি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দাও। ২। ঘূর্ণনগতি ও ঘূর্ণন চলনগতির মধ্যে পার্থক্য কী?

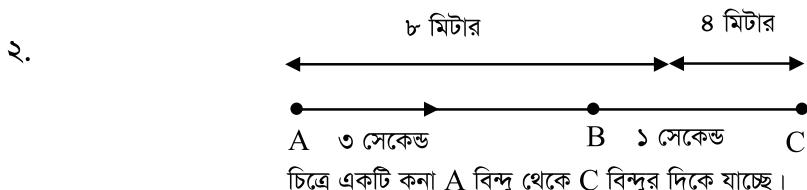
৩। চিত্রসহ সরণ ব্যাখ্যা কর। ৪। দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য কী? ৫। মন্দন ও ত্বরণের মধ্যে পার্থক্য কী?

সূজনশীল প্রশ্ন :

১. খুশবু, হাদিতা ও সদিচ্ছা বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা হলো। স্কুলে পৌছাতে খুশবুর ১৫ মিনিট, হাদিতার ২০ মিনিট এবং সদিচ্ছার ৩০ মিনিট সময় লাগল। খুশবুর বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৫০০ মিটার, হাদিতার ১৮০০ মিটার এবং সদিচ্ছার ২১০০ মিটার।

ক. পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে? খ. দেয়াল ঘড়ির দোলকের গতি কী ধরনের গতি? ব্যাখ্যা কর।

গ. খুশবুর দ্রুতি নির্ণয় কর। ঘ. হাদিতা ও সদিচ্ছার কার দ্রুতি বেশি? গাণিতিক বিশ্লেষণ করে মতামত দাও।



ক. স্থিতি কাকে বলে?

খ. প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে কী বুঝায়?

গ. A বিন্দু থেকে C বিন্দু পর্যন্ত যেতে কণাটির গড় বেগ কত? নির্ণয় কর।

ঘ. সুষম ত্বরণে চলে কণাটি যদি A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে পৌঁছে তাহলে কি সময় বেশি লাগবে না কম লাগবে?

উত্তরের স্পষ্টক্ষে যুক্তি দাও।

নিজেরা কর

১। চার পাঁচজন বন্ধু মাঠে যাও। একটি থামাঘড়ি সাথে নাও। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত সবাইকে দৌড়াতে বল।

ঐ দূরত্ব যেতে কার কত সময় লাগে তা থামাঘড়ির সাহায্যে বের কর (থামাঘড়ির না থাকলে হাতঘড়ি ব্যবহার করতে পার)। সময় ও দূরত্ব থেকে দ্রুতি বের কর।

২। তোমার এলাকার সড়কপথে দুর্ঘটনা ঘটার কারণ অনুসন্ধান কর।

একাদশ অধ্যায়

বল এবং সরল যন্ত্র

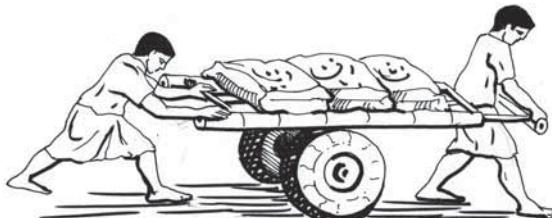
কোনো বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাতে কিছু একটা প্রয়োগ করতে হয়। এই একটা কিছুই হলো বল। এই বলের আবার বিভিন্ন রূপ আছে। তাছাড়া রয়েছে বল প্রয়োগ করার বিভিন্ন কৌশল। এই কৌশল প্রয়োগে কাজকে বিভিন্নভাবে সহজ করা যায়। যা কিছু এই বলকে কাজ করতে সহজ করে তা হল সরল যন্ত্র। বর্তমান অধ্যায়ে তোমরা বল ও সরল যন্ত্র সম্পর্কে জানবে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বল কী তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তুর ওপর বিভিন্ন প্রকার বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সরল যন্ত্রের সুবিধা তুলনা করতে পারব।
- মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সরল যন্ত্রের কাজের তুলনা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বলের প্রভাব এবং সরল যন্ত্রের অবদান প্রশংসা করব।
- ব্যবহারিক জীবনে সরল যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারব।

পাঠ ১-২ : বল কী?

তোমরা কি জান যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জানা বা অজানা বিভিন্নভাবে আমরা বল প্রয়োগ করে থাকি। তোমরা ভাবছ এই বলটা আবার কী? সকাল থেকেই শুরু হয় আমাদের নানাভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপর বলের প্রয়োগ। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার জন্য টেপ ছাড়া বা টিউবওয়েলে চাপ দিতে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হবে। এমনকি পড়তে বসার সময় চেয়ারকে টেনে বসতেও বল প্রয়োগ করতে হয়। আবার ধর, তোমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে তোমার জ্যামিতি বক্সটি আছে। এটিকে বের করতে এবং বের করার পর পুনরায় এটিকে বন্ধ করতে ড্রয়ারটিকে যথাক্রমে টান বা ধাক্কা দিতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই তোমার ঘরের বাতিটি জ্বালানোর জন্য সুইচটি অন করেছ। এটিতেও কিন্তু বলের প্রয়োগ হয়েছে। কাউকে কি কোকের ক্যান খুলতে দেখেছ। এটিও কিন্তু বল প্রয়োগ। ফুটবলে লাথি দেওয়া বা ক্রিকেট বলে ব্যাট দিয়ে আঘাত ও বল। উপরোক্ত ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে দু'টো জিনিস জড়িত- ধাক্কা বা টান। এই ধাক্কা বা টানই হলো বল।



চিত্র- ১১.১ বল হচ্ছে ধাক্কা বা টান

বস্তুর ওপর বিভিন্ন প্রকার বলের প্রভাব

তোমার তো নিশ্চয়ই একটি রবার আছে। তুমি কি কখনও দেখেছ একে বাঁকালে, মোড়ালে, চেপে ধরলে বা টানলে এর আকৃতির ক্রিপ পরিবর্তন হয়। এই বাঁকানো, মোচড়ানো, চাপানো, লম্বা করার চেষ্টাও হলো একই বস্তুর ওপর বলের বিভিন্ন রূপের প্রভাব। এগুলোর কি চিত্র অংকন করতে পারবে?

আরেকটি মজার ঘটনা লক্ষ কর। মার্বেল দিয়ে কি কখন খেলেছ? প্রথমে মার্বেলগুলো সামনে ছড়িয়ে রাখতে হয়। পরে একটি দূর থেকে অন্য একটি মার্বেল দ্বারা ছড়ানো মার্বেলগুলোর মধ্যে কোনো একটিকে আঘাত করার জন্য লক্ষ স্থির করতে হয়। যখন তুমি তোমার হাতের

মার্বেলটি ছুড়বে তখন এটি তোমার লক্ষ্যের মার্বেলটিকে আঘাত করলে তুমি কি দেখতে পার? দেখবে মার্বেলটি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হয়েছে। হয়তো দেখবে এটি আবার অন্য কোনো স্থির মার্বেলকে আঘাত করেছে। এমনকি এই প্রক্রিয়া কিছুক্ষণ চলতে পারে। গতিপ্রাপ্ত মার্বেলটির ওপর কোন বল প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এ ছাড়া দেখা যায় মাটির ঘর্ষণ বলও এক সময় মার্বেলটিকে থামিয়ে দেয়।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। কোনো একটা মাইক্রোবাস হয়তো রাস্তায় বিকল হয়ে পড়ল। তখন হয়তো একে পুনরায় চালু করার জন্য ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন। তখন একজন হয়তো একে ধাক্কা দিলে এটি নাও নড়তে পারে। কিন্তু ৪/৫ জন একসাথে ধাক্কা দিলে এটি নড়তে পারে এমনকি চলতেও পারে। এখনে বল প্রয়োগের ফলে স্থির বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায়।

এখন বলতে পারবে এখনে কী কী ঘটনা ঘটল। বলের প্রভাবে মার্বেলের গতির বিভিন্ন পরিবর্তন হলো। একইভাবে সাধারণত বল প্রয়োগে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায়, গতিশীল বস্তুর গতি বাড়ানো বা কমানো যায় এবং গতিশীল বস্তুকে থামানো যায়। উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। বস্তুর ওপর বলের প্রয়োগের ফলে-

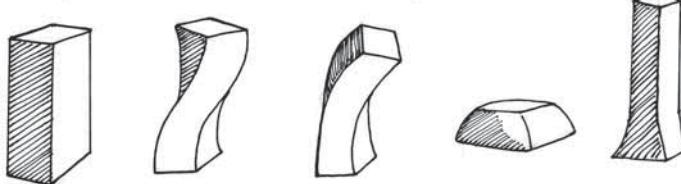
- কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল এবং গতিশীল বস্তুকে স্থির করে বা করতে চায়।
- চলস্তুর গতি বাড়াতে বা কমাতে পারে।
- চলস্তুর বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন করে।
- কোনো বস্তুর আকার বা আয়তন পরিবর্তন করতে পারে।

অনুরূপভাবে বলা যায়, যা কোনো স্থির বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা যা কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তার গতি, আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাই বল।

বৈদ্যুতিক সুইচ ‘অফ’ বা ‘অন’ করা, কোকের ক্যানের মুখ খুলা, মসলা পেষা; বোৰা তোলা; চিল মারা; নৌকা বাওয়া; চলাফেরা করা; কম্পিউটারের মাউসে ক্লিক করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বলের ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে টেলাগাড়ি, রিক্সার প্যাডেল সবকিছুতেই বলের প্রয়োগ দেখা যায়।

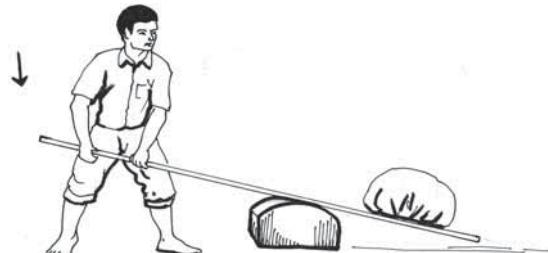
পার্ট-৩ : সরল যন্ত্র

এক খণ্ড পাথর বা ইটের উপর ঠেস দিয়ে লম্বা লোহা এমনকি কাঠের দণ্ডের এক প্রাপ্তে বল প্রয়োগ করে অন্য প্রাপ্ত দিয়ে ভারি কোনো বস্তুকে উপরে তুলতে বা সরাতে দেখেছ নিশ্চয়? হ্যাঁ লোহা বা কাঠের দণ্ডটিকে বিশেষ



চিত্র- ১১.২ বস্তুর উপর বলের প্রভাব

এই ব্যবস্থায় ব্যবহার করার ফলে তারি কোনো বস্তুকে সরানোর কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। তোমার শ্রেণিকক্ষে এই ধরনের কাজ সহজেই করে দেখতে পার। এক্ষেত্রে লোহা বা কাঠের দণ্ডের এভাবে ঠেস দিয়ে কাজ করার মাধ্যমে এটি একটি সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে একটি বিশেষ কৌশলে প্রয়োগকৃত বল দ্বারা সহজেই কাজটা করা সম্ভব হয়েছে। মূলকথা, কম বল প্রয়োগেও অধিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে।



চিত্র ১১.৩ : সরল যন্ত্র

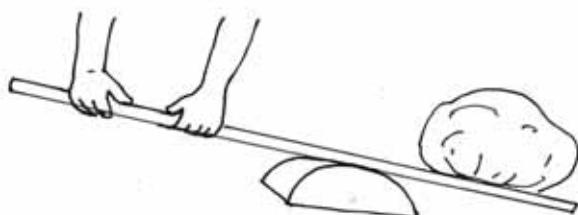
কাজকে এভাবেই সহজ করার জন্য দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানাবিধ সরল যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। যেমন: কাঁচি, সাঁড়াশি, হাতুড়ি, শাবল, কপিকল, লিভার ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো কৌশল প্রয়োগ করে কাজকে সহজ করা যায়। উপরে উল্লিখিত সরল যন্ত্র নিম্নোক্ত এক বা একাধিকভাবে কাজকে সহজ করে।

- প্রযুক্ত বলকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে।
- কম বল প্রয়োগে কোনো কাজ সম্পন্ন করে।
- বলকে কোনো একটি সুবিধাজনক দিকে প্রয়োগ করে।
- কাজকে নির্দিষ্ট একটি উপায়ে সম্পন্ন করে যা অন্য কোনো উপায়ে করা বিপদ জনক।
- গতি ও দূরত্ব বৃদ্ধি করে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, সকল যন্ত্রেই কাজ করতে বাইরে থেকে শক্তির প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা আরও বিভিন্ন সরল যন্ত্রের সাথে পৃথক পৃথকভাবে পরিচিত হবে এবং এদের থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করা শিখবে।

পাঠ-৪ : লিভার

লিভার হলো একটি সরল যন্ত্র, যাতে একটি শক্ত দণ্ড কোনো অবলম্বনের কোনো কিছুর উপর ভর করে মুক্তভাবে ওঠানামা করে বা ঘোরে। লিভারের একটি সাধারণ উদাহরণ হলো শাবলকে ইট বা পাথরের উপরে ভর করে কোনো ভারি বস্তুকে উঠাতে সাহায্য করে। এখানে ভারি বস্তুটি হলো ভার এবং এই ভারকে উঠাতে যে বল প্রয়োগ করা হয় তা হলো বল। শক্ত দণ্ডটিকে ঠেকানোর জন্য কোনো অবলম্বনের যে বিন্দুতে মুক্তভাবে ওঠানামা করে বা ঘোরে তা হলো ফালক্রাম। লিভার কোনো ভারি বস্তুকে কম বল প্রয়োগ করে উঠাতে বা সরাতে সাহায্য করে। এখানে যান্ত্রিক সুবিধা হলো—



চিত্র ১১.৪ : লিভার

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{প্রযুক্ত বল}}$$

এখন তোমাকে বুঝতে হবে কীভাবে লিভার ব্যবহার করে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়। লিভারের নীতিমালা হলো নিম্নরূপ :

$$\text{বল} \times \text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য} = \text{ভার} \times \text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}$$

এখানে বল যে বিশুদ্ধতে প্রযুক্ত হয় তা থেকে ফালক্রাম

পর্যন্ত দূরত্ব হলো বলবাহুর দৈর্ঘ্য। অনুরূপভাবে

ভার থেকে ফালক্রাম পর্যন্ত দূরত্ব হলো ভারবাহু।

তাহলে উপরের নীতিমালা থেকে নিম্নোক্তভাবেও বোঝা যায়।



চিত্র ১১.৫ : লিভার

$$\frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}}$$

এখানে নির্দিষ্ট বল দ্বারা কীভাবে নির্দিষ্ট ভরের বন্ধনে উঠানো বা সরানোর ক্ষেত্রে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করব তা একটি কাজের মাধ্যমে দেখব।

কাজ : একটি পেসিল, রঞ্জারের সাথে রবার ব্যান্ড দিয়ে একটি লিভার তৈরি কর। এখানে পেসিলটি ফালক্রাম হিসাবে কাজ করবে। এবার প্রথমেই রঞ্জারটিকে সামনে-পিছনে সরিয়ে ভূমির সমান্তরাল কর। এবার দুই পাশে পাঁচটি করে ৫০ পয়সার মুদ্রা এমনভাবে রাখ যেন পুনরায় রঞ্জারটি ভূমির সমান্তরাল হয়। এবার ডান দিকে পুনরায় আরো ৫টি মুদ্রা রাখ। কী হবে! নিশ্চয়ই ডান দিকটি বুঁকে পড়েছে? এবার পুনরায় রঞ্জারটি সামনে পিছনে করে বাম প্রান্তে ৫টি এবং ডান প্রান্তে ১০টি মুদ্রা রেখে ভূমির সমান্তরাল কর। এতে কী হলো? ভর বাহুর দৈর্ঘ্য কমে গেল এবং বল বন্ধনের দৈর্ঘ্য বেড়ে গেল। একে আমরা বলতে পারি যান্ত্রিক সুবিধা আদায় হলো। অর্থাৎ কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তোলা হয়েছে। পুনরায় আরও ৫টি পয়সা দিয়ে দেখব কী হয়?

পাঠ ৫-৬ : লিভারের শ্রেণি বিভাগ

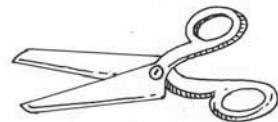
প্রযুক্ত বল, ভার ও ফালক্রামের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণির লিভার: এই ক্ষেত্রে ফালক্রামের অবস্থান প্রযুক্ত বল ও ভারের মাঝখানে থাকে। যেমন: কঁচি, সাঁড়াশি, নিঙি, নলকূপের হাতল, পানি সেচের দোন, টেঁকি।

দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার: এই ক্ষেত্রে ভার থাকে মাঝখানে এবং প্রযুক্ত বল ও ফালক্রাম দুই প্রান্তে অবস্থান করে। যেমন: যাঁতি, এক চাকার ঠেলা গাড়ি, বোতল খোলার যন্ত্র।

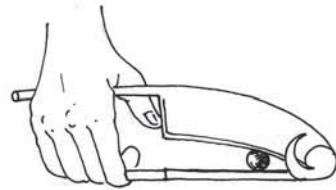
তৃতীয় শ্রেণির লিভার: এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলটি মাঝখানে কার্যকর হয়। ভার ও ফালক্রাম থাকে দুই প্রান্তে। যেমন: চিমটা। এখন এই কঁচি, যাঁতি বা চিমটা ব্যবহার করে কীভাবে কাজকে সহজে করা যায় তা দেখব।

প্রথমত : কঁচি দিয়ে কিছু কঁটার সময় উক্ত বস্তু (যেমন কাপড়) যত বেশি ফালক্রামের কাছ রেখে কাটা যাবে ততই কাটা সহজ হবে। মূলত এক্ষেত্রে ভার বাহর দৈর্ঘ্যকে কমানোর চেষ্টা করে যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।



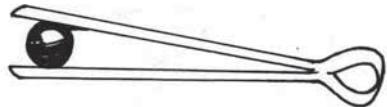
চিত্র ১১.৬ : কঁচি

দ্বিতীয়ত : যাঁতির ক্ষেত্রে ভর (যেমন সুপারি) কে যত বেশি ফালক্রামের কাছে রাখা যাবে, সুপারি কাটতে তত কম বল প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রেও ভার বাহর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বল বাহর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।



চিত্র ১১.৭ : যাঁতি

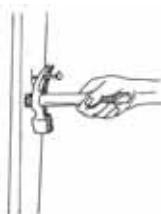
তৃতীয়ত: একটি চিমটা দিয়ে কিছু আটকানোর ক্ষেত্রে আঙুলের চাপাটি যত বেশি বস্তুর কাছাকাছি হবে বস্তুটিকে আটকে রাখা তত বেশি সহজ হবে। এখনেও মূলত বল বাহর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে বা ভার বাহর দৈর্ঘ্য কমিয়ে কাজ সহজ করা হয়।



চিত্র ১১.৮ : চিমটা

পাঠ ৭ : হাতুড়ি

একটি হাতুড়ির সাধারণত দুই প্রান্ত থাকে। এক প্রান্ত দিয়ে কাঠে লোহা চুকানো হয় এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে কাঠ থেকে লোহা বের করা হয়। যখন হাতুড়ি দিয়ে লোহা বের করা হয় তখন এটি লিভার হিসাবে কাজ করে। এখানে হাত দিয়ে হাতুড়ি ধরা হয় বিধায় হাতটি ফালক্রাম, লোহা বের করা বাধা ভার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া বলটি মাঝখানে কাজ করে, ফলে এটি তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র ১১.৯ : হাতুড়ি

সাঁড়াশি

এটিও লিভার হিসাবে কাজ করে। সাঁড়াশির যেখানে হাত দিয়ে ধরা হয় সে প্রান্তটিতে বল এবং যে প্রান্তটিতে কোনো বস্তুকে ধরে রাখা যায় সে প্রান্তটিতে ভার কাজ করে। এখানে ফালক্রামটি মধ্যে থাকে বলে এটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের অন্তর্ভুক্ত। এটিতে ভারবাহুর দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয়, তাই কেবলমাত্র বলবাহুর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে এর যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।



চিত্র ১১.১০ : সাঁড়াশি

পাঠ ৮-৯ : হেলানো তল ও কপিকল

হেলানো তল হলো একটি সরল যন্ত্র। এর সাহায্যে একটি ভারি বস্তুকে খাড়াভাবে তোলার চেয়ে এটাকে গড়িয়ে ওপরে তোলা যায়। হেলানো তলের ব্যবহারে কাজ অনেক সহজ হয় বলেই উচু পুলে উঠার রাস্তা, দালানের ছান্দে উঠার সিঁড়ি ইত্যাদি খাড়া ভাবে তৈরি না করে হেলানোভাবে তৈরি করা হয়। হেলানো তলের উপর দিয়ে বস্তুকে গড়িয়ে তুলতে দূরত্ব বেশি অতিক্রম করতে হয় কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হয় কম। এটা বোবার জন্য এর যান্ত্রিক সুবিধা বুঝতে হবে। হেলানো তলের যান্ত্রিক সুবিধা হলো:

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{হেলানো তলের দৈর্ঘ্য}}{\text{হেলানো তলের উচ্চতা}}$$

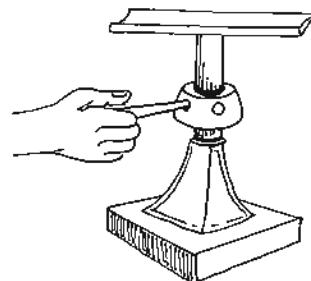
এখান থেকে বুঝা যায় একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য হেলানো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।

এটা কি জানো?

তোমরা কি কেউ দেখেছে কীভাবে একটি গাঢ়ীর চাকা পরিবর্তন করা হয়? একটি সরল যন্ত্রের বা জ্যাক ক্লু এর সাহায্যে প্রথমে গাঢ়ীটির একথানে উচু করা হয় যাতে সহজেই চাকা খুলে আবার লাগানো যায়।

জ্যাক ক্লু একসাথে লিভার ও হেলানো তলের নীতি মেনে কাজ করে। ক্লুর পেঁচানো অংশের উচ্চতা হলো হেলানো তলের উচ্চতা এবং পেঁচানো পথ দিয়ে ঘূরে যেতে ব্যতৃকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা হলো হেলানো তলের দৈর্ঘ্য। এই যন্ত্রে হেলানো তলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।

অপর দিকে হাতলে যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয় তা র কাজ করে তার লম্ব বরাবর। ফলে জ্যাক ক্লু একই সাথে বল বৃক্ষি ও বলের দিক পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে।



চিত্র ১১.১১ : জ্যাক ক্লু

কপিকল

কপিকল হলো এক ধরনের সরল যন্ত্র। এতে একটি খাঁজ কাটা চাকতি থাকে যাতে একটি রশি দুই দিকে ঝুলিয়ে দেয়া যায়। কপিকলটি একটি অক্ষদণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘূরে যা একটি ছীর বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে। কপিকল সচরাচর কোনো ভারি বস্তু উপরে উঠাতে বা কুয়া থেকে পানি উঠাতে ব্যবহৃত হয়। কপিকল অনড় বা নড়নক্ষম হতে পারে। অনড় কপিকলে বস্তুটি ছীর থাকে, কেবলমাত্র চাকাটি ঘূরে। অন্যদিকে নড়নক্ষম কপিকলে বস্তুটি ছীর নয় বরং এটি কপিকলের সাথে এটিও ঘূরতে থাকে।



চিত্র ১১.১২ : কপিকল

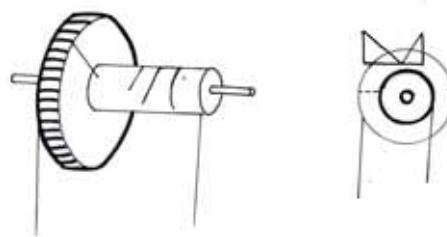
আমরা সচরাচর পতাকাটা উপরে উঠানোর জন্য অনড় কপিকল ব্যবহার করে থাকি। এক্ষেত্রে রশি টানার সাথে শুধু মাত্র চাকাটি ঘোরে। এখানে পতাকাকে যত উপরে উঠাবার প্রয়োজন হয় রশিকে তত নিচের দিকে টানতে হয়। ফলে এর মাধ্যমে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে বলের দিক পরিবর্তন করা হয়।

নড়নক্ষম কপিকল যেহেতু নিজেও ঘূরে তাই এতে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে ভারকে যত উপরে উঠাবার দরকার হয় তার দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের রশি টানতে হয়। তাছাড়া এই সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি অনড় ও একটি নড়নক্ষম কপিকল যৌথভাবে ব্যবহার করা হয়। এই কৌশলকে ব্যবহার করে বলের দিককে সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যায়। নড়নক্ষম কপিকলের যান্ত্রিক সুবিধা সাধারণত অনড় কপিকলের চেয়ে দ্বিগুণ হয়।

$$\text{কপিকলের যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{বল যতটা পথ অতিক্রম করে}}{\text{ভার যতটা পথ অতিক্রম করে}}$$

পাঠ ১০-১১ : চাকা- অক্ষদণ্ড

চাকা- অক্ষদণ্ড এক ধরনের সরল যন্ত্র। এটা মূলত লিভারের ভিন্নরূপ। একানে চাকা বলবাহু এবং অক্ষদণ্ডটি ভারবাহু হিসাবে কাজ করে। এখানে ভারকে একটি রশির মাথায় বাঁধা হয় এবং চাকাটিকে ঘূরিয়ে সে রশিটি অক্ষদণ্ডে জড়ানো হয়। চাকা ও অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের অনুপাতের ওপর এর যান্ত্রিক সুবিধা নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের ৬ গুণ হয় তবে ১ কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করে ৬ কিলোগ্রাম ভরের বস্তকে উপরে উঠানো যাবে। তাহলে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, চাকা অক্ষদণ্ডের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি জন্য এর চাকার ব্যাসার্ধ বেশি হওয়া প্রয়োজন। মোটরগাড়ির হেইল, স্কু-ড্রাইভার ইত্যাদি চাকা-অক্ষদণ্ডের মতো কাজ করে।



চিত্র ১১.১৪ : চাকা-অক্ষদণ্ড

কাজ : স্কু-ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ২টি ভিন্ন আকৃতি স্কু-ড্রাইভার, দুটি

সমান লম্বা স্কু, নরম কাঠ

পদ্ধতি : প্রথম ছোট স্কু-ড্রাইভারটি দিয়ে একজন শিক্ষার্থী স্কুকে ঢুকাও। এক্ষেত্রে সে হাতলকে পাঁচবার সম্পূর্ণভাবে ঘূরাবে। অনুরূপভাবে বড় হাতলের স্কু-ড্রাইভার দ্বারা ৫ বার ঘূরিয়ে দেখ। কি কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এই

পার্থক্যই তোমাকে বলে দিবে স্কু-ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা পেতে কী ধরনের স্কু-ড্রাইভার ব্যবহার করবে।



চিত্র ১১.১৫ : স্কু-ড্রাইভার

পাঠ ১২ : মানবদেহ ও সরল যন্ত্র

মানবদেহ একটি জটিল যন্ত্র। এর কোনো কোনো অঙ্গ সরল যন্ত্রের মতো কাজ করে থাকে। মূলত আমাদের শরীরের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসরণ করে কাজ করে থাকে। নিচে এমন তিনটি অঙ্গের সাথে পরিচিত হবে।

উপরের চিত্রগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে কীভাবে মানুষের মুখের চোয়াল, পায়ের নিচের অংশ ও হাত সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এবার চিত্র কর কীভাবে এই অঙ্গগুলো ব্যবহার করে কাজ করলে কোন কাজকে সহজে করা যাবে। তুমি কি এখন বলতে পারবে আমরা খাবার চিবানোর সময় সামনের দাঁত দিয়ে না চিবিয়ে কেন মাড়ির দাঁত দিয়ে চিবাই?



চিত্র ১১.১৫ মানবদেহ ও সরল যন্ত্র

কাজ : একটি পাথর (১ কেজির মতো) তোমার আঙুলের ডগা থেকে কুনই পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রেখে অনুভব কর কেমন লাগছে। এর থেকে বুঝা যাবে হাতকে কীভাবে ব্যবহার করলে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

নতুন শব্দ : স্থির বন্ধ, গতিশীল বন্ধ, যান্ত্রিক সুবিধা, ফালক্রাম, চাকা, অক্ষদণ্ড, কপিকল

এই অধ্যায়ে যা শিখলাম

- বল প্রয়োগের ফলে বন্ধের অবস্থান, আকার, আকৃতি বা গতির পরিবর্তন হয় বা হতে পারে।
- সকল সরল যন্ত্রেই কোনো একটি বিশেষ উপায়ে একটি কৌশল প্রয়োগ করা যায় যার দ্বারা ঐ যন্ত্র থেকে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- লিভারের ক্ষেত্রে বলবাহু বা ভার বাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- কোনো বন্ধকে একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য যে কোনো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।
- নড়নক্ষম কপিকলের যান্ত্রিক সুবিধা সাধারণত অনড় কপিকলের চেয়ে দ্বিগুণ হয়।
- মানবদেহের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসারে কাজ করে থাকে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বল কোনো স্থির বন্ধকে ----- এবং গতিশীল বন্ধকে ----- করে বা করতে চায়।
২. সরল যন্ত্রে ----- বল প্রয়োগ ----- কাজ করা যায়।
৩. প্রথম শ্রেণির লিভারে ----- থাকে বল ও ভারের মাঝখানে।
৪. জ্যাক স্ক্রু একই সাথে ----- ও ----- পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার কোনটি?

- | | |
|----------|------------|
| ক. কঁচি | খ. সঁড়াশি |
| গ. চিমটা | ঘ. ঘাঁতি |

২. হেলানো তল থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে | খ. দৈর্ঘ্য কমিয়ে |
| গ. উচ্চতা বাড়িয়ে | ঘ. উচ্চতা কমিয়ে |

চিত্রটির সাহায্যে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্র

৩. চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রটির যান্ত্রিক সুবিধা কত?

- | | |
|-------|--------|
| ক. ৫ | খ. ৪০ |
| গ. ৬০ | ঘ. ৫০০ |

৪. তারবাহুর দৈর্ঘ্য ১৫ সে.মি. বৃদ্ধি করা হলে যান্ত্রিক সুবিধা--

- | | |
|-----------------|------------|
| i. কমবে | ii. বাঢ়বে |
| iii. সমান থাকবে | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

ক. বল প্রয়োগে বস্তুর কী কী ধরনের পরিবর্তন হয়?

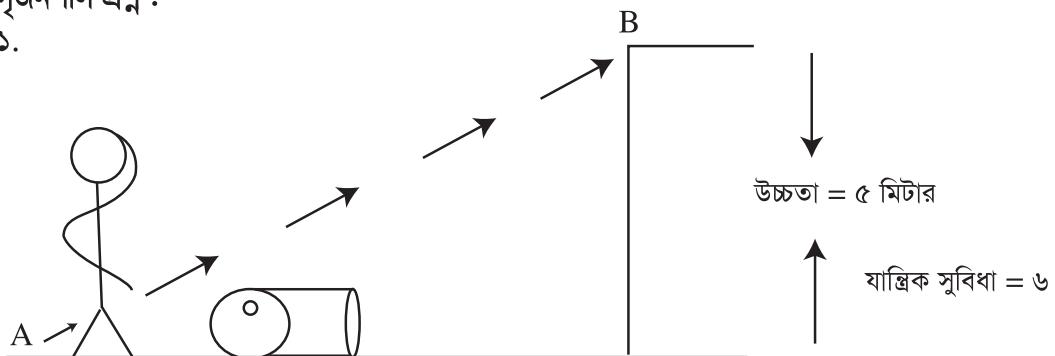
খ. কঁচি থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

গ. জ্যাক স্ক্রু কীভাবে কাজকে সহজ করে?

ঘ. স্ক্রু ড্রাইভারের হাতল কেমন হলে বেশি সুবিধা হয়?

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.



চিত্রে প্রদর্শিত লোকটি তেলের ড্রামটি উপরে তুলতে সমস্যায় পড়েছে। অথচ আশে পাশে কেউ নেই তাকে সাহায্য করার। এমতাবস্থায় একাই কোনো না কোনোভাবে তাকে ড্রামটি উপরে তুলতে হবে।

ক. ফালক্রাম কী? খ. সরলযন্ত্র কীভাবে কাজ করা সহজ করে?

গ. A থেকে B এর দূরত্ব নির্ণয় কর।

ঘ. লোকটি ড্রামটিকে তুলতে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তার সুবিধা আলোচনা কর।

২. মনি ও শিল্পী স্ট্যাপলার ব্যবহার করে তাদের কাগজ স্ট্যাপল করছিল। মনি স্ট্যাপলারের সামনের অংশে চাপ দিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে শিল্পী স্ট্যাপলারের মাঝখানে চাপ দিয়ে কাজ করছে।

ক. লিভার কী?

খ. কীভাবে ত্তীয় শ্রেণির লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়?

গ. মনি ও শিল্পীর ব্যবহৃত যন্ত্রটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

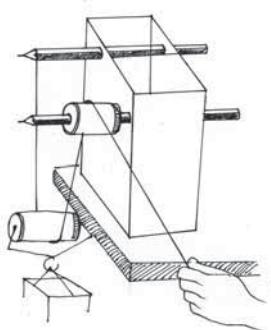
ঘ. মনি ও শিল্পীর, কার কাজের ধরনের পরিবর্তন করলে কাজ করা আরও সহজ হবে বিশ্লেষণ কর।

প্রজেক্ট : কপিকল তৈরি করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : শক্ত সুতা বা বৈদ্যুতিক তার, একটি কার্ড বোর্ড বৰু, ২টি পেনসিল, একটি ইট, দুটি খালি কোকের ক্যান।

চিত্রের মতো প্রথমে দুটি পেনসিলকে কার্ড বোর্ডের বাস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও যাতে এ দুটি হক হিসাবে কাজ করে। এবার একটি খালি কোকের ক্যানকে দু'পাশ থেকে ছিদ্র কর যেন এটি সহজেই পেনসিলকে দু'পাশ থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এবার চিত্রের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে কপিকলটি তৈরি কর। কি দেখলে

ইটটি সহজেই তোলা যাচ্ছে। ব্যাপারটি ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রথম শুধু একটি অনড় কপিকলের মতো তৈরি দেখে নাও।



ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗଠନ

ହାଜାର ହାଜାର ଧରେ ମାନୁଷ ଚିନ୍ତା କରେଛେ କୀଭାବେ ପୃଥିବୀ ଓ ମହାବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଁଯେଇଛେ । ବିଭିନ୍ନ ସମାଜେ ଏ ବିଷୟେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ କାହିଁନି ପ୍ରଚଲିତ ରଖେଇଛେ । ତବେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଭିନ୍ତିତେ ବେଶିର ଭାଗ ବିଜାନୀ ଏଥିନ ଏକଟି ତତ୍ତ୍ଵକେ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏ ତତ୍ତ୍ଵେ ବଲା ହୁଏ ଯେ, ମହା ବିକ୍ଷେପଣେର ମାଧ୍ୟମେ ମହାବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଁଯେଇଛେ । ମହାବିଶ୍ୱରେ ଏକଟି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଫ ପୃଥିବୀ । ପୃଥିବୀର ବାଇରେ ଦିକଟି ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟାସିଣୀଙ୍କ ଗଠନ ସହଜେ ବୋକା ଯାଇ ନା । ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟାସିଣୀଙ୍କ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କେ ଧାରଣା କରା ଯାଇ ଭୂମିକମ୍ପ, ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଅଗ୍ନ୍ୟଃପାତ -ଏ ଧରନେର ଘଟନା ଥେକେ ।

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରା

- ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଘଟନା ବର୍ଣନା କରତେ ପାରବ ।
- ପୃଥିବୀର ଗଠନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରବ ।
- ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିଚୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରବ ।
- ଭୂମିକମ୍ପେର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରବ ।

ପାଠ ୧-୨ : ମହାବିଶ୍ୱ ଓ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି

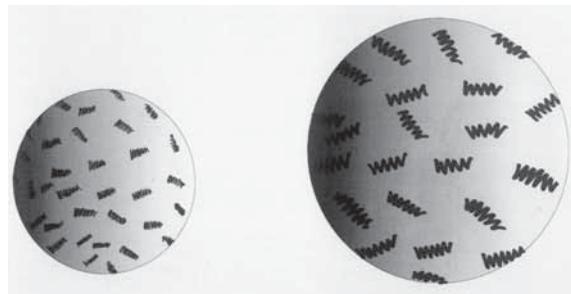
ତୋମରା ଜାନ, ଆମରା ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠର ଉପର ବାସ କରି । ଆମରା ଉପରେର ଦିକେ ତାକାଳେ କୀ ଦେଖିତେ ପାଇ? ଦିନେର ବେଳାଯ ଦେଖି ସୂର୍ୟ । କଥନେ ଦେଖି ମେଘ । ମେଘ ନା ଥାକଲେ ରାତରେ ଆକାଶେ ଦେଖି ଚାଁଦ, ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରା । କଥନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜେଗେଛେ ମନେ ଏହି ପୃଥିବୀ କୀଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହଲୋ? ସୂର୍ୟ, ତାରା, ଚାଁଦ ଏବା କୀଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଁଯେଇଛେ?

ବିଭିନ୍ନ ସମାଜେ ପୃଥିବୀ ଓ ମହାବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ କାହିଁନି ପ୍ରଚଲିତ ରଖେଇଛେ । ଯେମନ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନେର ରୂପକଥାଯ ବଲା ହୁଏ ଯେ, ଏକଟି ବିଶାଲ ଡିମ ଥେକେ ପ୍ରଥମେ ଏକଟି ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ । ସେଇ ଦୈତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥେକେ ଏହି ମହାବିଶ୍ୱରେ ସବକିଛୁର ଜନ୍ମ । ବିଜାନୀରା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟବହାର କରେ ପୃଥିବୀ ଓ ମହାବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ଧାରଣା ଦିଯେଇନ । ବିଜାନୀରା ଧାରଣା କରେନ, କୋଟି କୋଟି ବହୁ ପୂର୍ବେ ଛୋଟ ଅଥାବ ଭୀଷଣ ଭାରି ଓ ଗରମ ଏକଟା ବଞ୍ଚିପଣ୍ଡ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଁ ସକଳ ଦିକେ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିତେ ଶୁରୁ କରେ । ଏ ବିକ୍ଷେପଣକେ ମହାବିକ୍ଷେପଣ ବଲା ହୁଏ । ମହାବିକ୍ଷେପଣେର ପର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥ କଣା ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣାଯ ପରିଣତ ହୁଏ । ତାରପର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣାଗୁଲୋ କିଛୁଟା ଠାଣ୍ଡା ଓ ଏକତ୍ରିତ ହେଁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଫ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏଭାବେ ସୂର୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏକଦିକେ ତଥନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ମିଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଫ ସୃଷ୍ଟି ହାଇଲ । ଏକଇ ସାଥେ ତଥନ ମହାବିଶ୍ୱ ଆରା ବେଦେ ଯାଇଲ ।



ଚିତ୍ର ୧୨.୧ : ମହାବିକ୍ଷେପଣ

- ক. ১০ থেকে ১৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্বের সকল শক্তি ও পদাৰ্থ ছোট একটি জায়গায় কেন্দ্ৰীভূত ছিল।
- খ. মহাবিশ্ব ঠাণ্ডা হচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে আবাৰ ছোট ছোট বস্তুকণায় পৱিণ্ট হচ্ছে।
- গ. প্ৰায় এক বিলিয়ন বছর সময়ে ছোট ছোট বস্তুকণা একত্ৰিত হয়ে তাৰা/নক্ষত্ৰে পৱিণ্ট হচ্ছে।
মহাবিশ্ব আৱণ্ড বিস্তৃত বা বড় হচ্ছে।



চিত্ৰ ১২.২ : বেলুন মডেল

মহাবিশ্বের সকল শক্তি, পদাৰ্থ, মহাকাশ সব কিছু এই বিশ্বেৱণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ধাৰণা কৰা হয় সূৰ্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তাৰ কিছু অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তাৰপৰ এখন থেকে প্ৰায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছর পূৰ্বে এই ধূলিকণা একত্ৰিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

মহাবিশ্বেৱণেৰ সমৰ্থনে প্ৰমাণ : মহাবিশ্ব একটি মহাবিশ্বেৱণেৰ মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তাৰ পক্ষে অনেক তথ্যপ্ৰমাণ রয়েছে। এৱ একটি প্ৰমাণ হলো, মহাবিশ্ব এখনও বিস্তৃত হচ্ছে। মহাকাশেৰ গ্যালাক্সি/ছায়াপথ ও তাৰাসমূহ এক অপৱেৱ কাছ থেকে দূৰে সৱে যাচ্ছে। কাজেই এৱা হয়তো একসময় একসাথে ক্ষুদ্ৰ একটি জায়গায় ছিল; বিশ্বেৱণেৰ মাধ্যমে এৱা আলাদা হয়েছে।

পাঠ ৩-৪ : সূৰ্য, পৃথিবী ও চন্দ্ৰেৰ পৱিচয়

তোমৰা জেনেছ, আমাদেৱ মিঞ্চিওয়ে ছায়াপথেৱ একটি নক্ষত্ৰ সূৰ্য। এটি একটি নক্ষত্ৰ কাৱণ এৱ নিজেৰ আলো আছে। সূৰ্য আসলে গ্যাসেৰ একটি পিণ্ড। এই গ্যাসেৰ পিণ্ডে হাইড্ৰোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মহাকৰ্ষ বলেৱ সাহায্যে একত্ৰ হয়ে থাকে। হাইড্ৰোজেন গ্যাস পৱল্পৱেৱ সাথে যুক্ত হওয়াৱ সময় প্ৰচুৱ তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এৱপৰ সেই তাপ ও আলো সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সূৰ্য অনেক পৱিমাণে তাপ ও আলো উৎপন্ন কৱে। তা থেকে কিছু পৱিমাণে তাপ ও আলো আমাদেৱ পৃথিবীতে এসে পৌছায়।

সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৱে কতগুলো জ্যোতিক ঘুৱাবে। সূৰ্য এবং একে কেন্দ্ৰ কৱে ঘূৰ্ণমান সকল জ্যোতিক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদেৱ সৌৱজগত গঠিত। সৌৱজগতেৰ বেশিৰ ভাগ জায়গায়ই ফাঁকা। সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৱে ঘুৱাবে গ্ৰহ, উপগ্ৰহ, ধূমকেতু ইত্যাদি জ্যোতিক।

সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৱে স্বাধীনভাৱে ঘুৱাবে আটটি গ্ৰহ। পৃথিবী এমন একটি গ্ৰহ। পৃথিবীৰ আকৃতি গোলকেৱ মতো। পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদাৰ্থ রয়েছে। কিন্তু পৃথিবী সূৰ্যেৰ মতো তাপ ও আলো উৎপাদন কৱতে পাৱে না। তাই আলো ও তাপেৰ জন্য পৃথিবী সূৰ্যেৰ উপৱ নিৰ্ভৱ কৱে। সূৰ্যেৰ আলোকে ব্যবহাৰ কৱে উত্তিদি খাদ্য তৈৱি কৱে। উত্তিদেৱ তৈৱি খাদ্যেৱ উপৱ নিৰ্ভৱ কৱে প্ৰাণীৰা বেঁচে আছে। সূৰ্য থেকে তাপ আসে বলে পৃথিবী খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। এভাৱে সূৰ্যেৰ আলো ও তাপ পৃথিবীতে জীবদেৱকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমাদেৱ পৃথিবী সূৰ্যকে কেন্দ্ৰ কৱে ঘোৱে। তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্ৰ কৱে ঘুৱাবে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীৰ উপগ্ৰহ বলা হয়। চাঁদ নিজে তাপ বা আলো উৎপন্ন কৱতে পাৱে না। তাহলে চাঁদকে আমৰা আলোকিত দেখি কেন? আসলে সূৰ্যেৰ আলো চাঁদেৱ পৃষ্ঠে পড়ে প্ৰতিফলিত হয়ে। তাই আমৰা চাঁদকে আলোকিত দেখি। চাঁদ ২৭ দিন

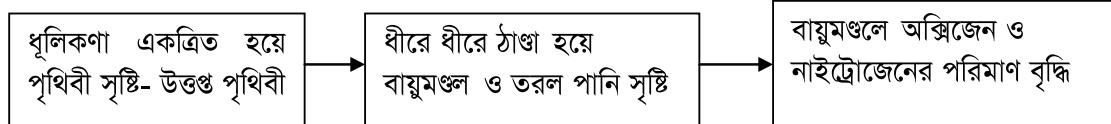
৮ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। চাঁদ পৃথিবীর আয়তনের পথগুশ তাগের একভাগ। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। আকাশে তো সূর্য আর চাঁদকে সমানই মনে হয়, তাই না? কেন এমন মনে হয়? সূর্য অনেক দূরে বলে একেও ছোট দেখায়। আচ্ছা, সূর্য যদি একটা ফুটবলের মতো হয় তাহলে পৃথিবী কতটুকু? পৃথিবী তাহলে হবে একটা বালুকণার সমান।

আমরা দেখি পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য উপযোগী স্থান। পৃথিবীর বাইরে অন্য এহে, নক্ষত্রে বা উপগ্রহে কি জীবেরা বাস করে। ছোট, বড় বা যে কোনো ধরনের জীব। বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন যে, অন্য কোথাও জীব আছে কি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কেন তাহলে শুধু পৃথিবীতেই জীবন আছে? পৃথিবীতে এমন কী আছে যে এখানে জীবেরা বাস করতে পারে?

ধারণা করা হয়, সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তার লক্ষ লক্ষ বছর পর এই ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। শুরুর দিকে পৃথিবী বেশ গরম ছিল। এত গরম ছিল যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ টগবগ করে ফুটতো। জীবনের জন্য যে তরল পানি দরকার তা ছিল না। বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। পৃথিবী এই অবস্থায় থাকলে কোন জীবের উদ্গুর হতো না।



চিত্র ১২.৩ : সূর্য ও পৃথিবী আকাশের/আয়তনের তুলনা

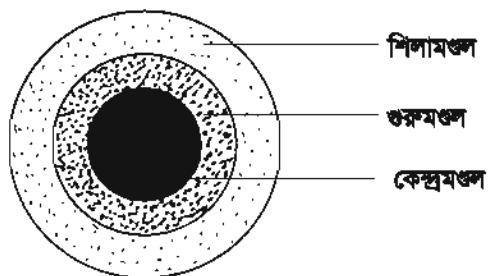


প্রবাহচিত্র : পৃথিবীতে জীবের উপযোগী পরিবেশের বিকাশ

ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে তাপ সরে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে। ঠাণ্ডা হওয়ার সময় ভারী পদার্থগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে। আর হালকা পদার্থগুলো পৃষ্ঠের দিকে রয়ে গেছে। বায়বীয় পদার্থগুলো যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয়বাস্প, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি বায়ুমণ্ডল গঠন করেছে। এরপর পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হয়ে জলীয়বাস্প তরল পানি হয়ে সমুদ্র তৈরি করেছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়েছে। এসব উপাদান জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব উপাদান পৃথিবীতে তৈরি হওয়ায় পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে ও জীব টিকে থাকতে পারছে।

পাঠ ৫ : আমাদের বাসভূমি পৃথিবীর গঠন

তোমরা জেনেছ সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। এ সময় নিচের চিত্রের মতো পৃথিবীর তিনটি অংশ গঠিত হয়। হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরি করে। একে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। তারপর কিছুটা ভারি পদার্থগুলো তৈরি করেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূ-পৃষ্ঠ। আর সবচেয়ে ভারি পদার্থগুলো মিলে তৈরি করেছে পৃথিবীর ভেতরের অংশ। নিচে এ ভাগগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।



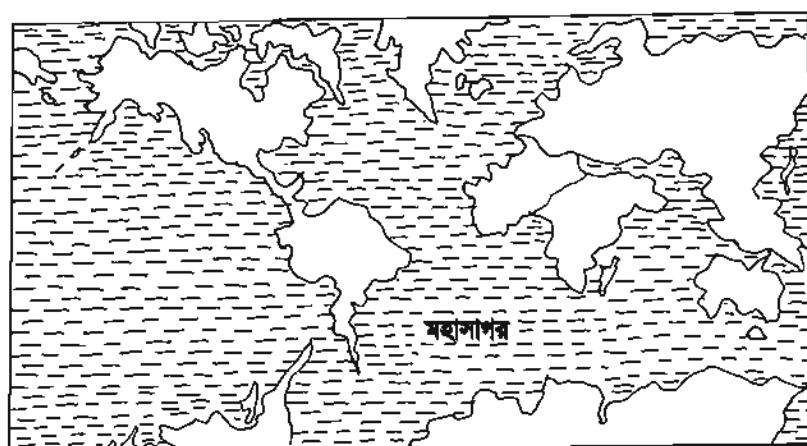
চিত্র ১২.৪ : পৃথিবীর অংশসমূহ

বায়ুমণ্ডল : যে বায়ীয় অংশটি পৃষ্ঠাকে ধিরে রেখেছে সেটই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জান যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, খুলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠার কাছাকাছি থাকে। তাই ভূ-পৃষ্ঠার কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠা থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্যটের চূড়ায় উঠতে চাও তবে শাস মেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে।

ভূ-পৃষ্ঠা থেকে এগার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রিপোক্সিয়ার। এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগ গ্যাস ও মেঘ থাকে। তোমরা জেনেছ যে, মেঘ আসলে জলীয়বাষ্প দিয়ে তৈরি। ট্রিপোক্সিয়ারের ঠিক উপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোক্সিয়ার। এই স্তর ভূ-পৃষ্ঠা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে গ্যাসগুলো খুব কম পরিমাণে আছে।

পাঠ ৬ : অগ্নমণ্ডল

আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠার উপর বাস করি। পৃথিবী-পৃষ্ঠার উপরে বায়ুমণ্ডল আর নিচের দিকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠাকে কেমন দেখি? পৃথিবীর পৃষ্ঠার কোথাও নরম মাটি, কোথাও শক্ত পাথর আর কোথাও পানি দ্বারা আবৃত। পৃথিবী পৃষ্ঠা বা ভূ-পৃষ্ঠার চারভাগের প্রায় তিন ভাগ জল আর এক ভাগ ছল। পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখলেই তোমরা বিষয়টি বুবাবে। ভূ-পৃষ্ঠার বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে বিশাল বিশাল সাগর ও মহাসাগর। এছাড়া আছে লেক বা হ্রদ, নদী, খাল-বিল ইত্যাদি।



চিত্র ১২.৫ : পৃথিবীর মানচিত্রে সাগর ও মহাসাগর

মানচিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশ। অন্য মহাসাগরগুলো হচ্ছে প্রশান্ত, আটলান্টিক, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর। সাগরের পানিতে থচুর মাছ সহ নানা জীব বাস করে। সাগরের পানির উপর দিয়ে চলে মালবাহী জাহাজ।

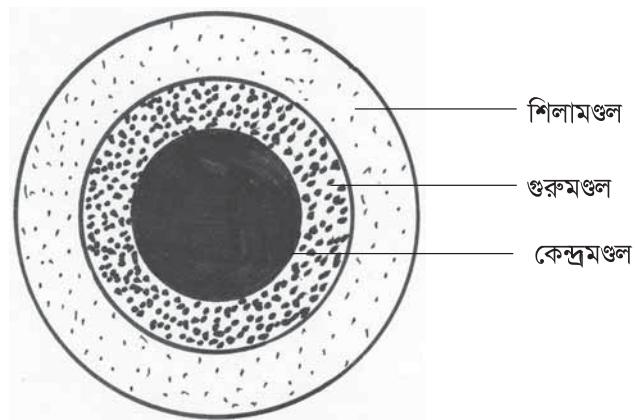
তোমরা জান যে, বৃষ্টি ও বরফগলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। নদী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

আসলে বরফ গলা পানি ও বৃষ্টির পানি গড়িয়ে নামতে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালার চূড়ায় অনেক বরফ জমা আছে। এই বরফগলা পানি যখন পর্বতের গা বেয়ে নেমে আসে তখন সরু নদীর সৃষ্টি হয়। এই সরু নদীর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে নদী বড় হতে থাকে। নেপাল, ভারত ও ভুটান ও বাংলাদেশে বেশ বৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বতমালায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলো এই বৃষ্টির পানি বহন করে। তাই পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই নদীগুলো বেশ বড়।

পাঠ ৭ : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আর জলমণ্ডলের নিচে পৃথিবীর ভেতরের অংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ঘিরে যে শক্ত স্তর রয়েছে তাই শিলামণ্ডল। শিলামণ্ডল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে থায় একশত কিলোমিটার নিচে পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। শিলামণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডল আর সবশেষে পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে কেন্দ্রমণ্ডল (চিত্র-১২.৬)। ধারণা করা হয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পর বাইরের অংশ অর্ধাং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাপ চলে যাওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের দিক থেকে তাপ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল বেশ উত্তপ্ত।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে থায় ৩৫০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গোলকাকার জায়গা হলো কেন্দ্রমণ্ডল। কেন্দ্রমণ্ডলে নিকেল, লোহা, সীসা ইত্যাদি ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডলের ভেতরের অংশে এরা কঠিন কিন্তু বাইরের দিকে গলিত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের মাঝে রয়েছে গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডলের বেশির ভাগই কঠিন। কিন্তু এর কিছু অংশ আধা-গলিত অবস্থায় আছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, আগ্রেঞ্জিরির উদগীরণে এই অংশটি থেকে গলিত লাভ বের হয়ে আসে।



চিত্র ১২.৬ : পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নিচে খুব দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পৃথিবী অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তোমরা বড় হয়ে কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল সম্পর্কে আরও জানবে। তোমরা এই শ্রেণিতে কিছুটা জানবে শিলামণ্ডল সম্পর্কে।

পাঠ-৮ : প্লেট টেকটোনিক এবং আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ও ভূমিকম্প

মানুষ সবসময়ই জানতে চেয়েছে কেন ভূমিকম্প হয়? জানতে চেয়েছে কেন আগ্নেয়গিরির উদগীরণ হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কোনো জায়গা দিয়ে ভীষণ উত্তপ্ত তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে? বিভিন্ন বিজ্ঞানী, বিভিন্ন ধর্ম এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব নামে একটি তত্ত্ব নিয়ে আসেন। এই তত্ত্ব দ্বারা ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এ তত্ত্ব সকলের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব : এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো, ভূ-পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর শিলামণ্ডল কতগুলো অংশে বা খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোকে প্লেট বলা হয়। এই প্লেটগুলো গুরুত্বপূর্ণ তরল অংশের উপরে ভাসমান অবস্থায় আছে। এই প্লেটগুলো প্রতিবছরে কয়েক সেন্টিমিটার কোনো একদিকে সরে যায়। প্লেটগুলো কখনও একটি থেকে আরেকটি দূরে সরে যায়। আবার কখনও কখনও একে অন্যের দিকে আসে। কখনও কখনও প্লেটগুলো বছরে কয়েক মিলিমিটার উপরে ওঠে বা নিচে নামে। একটি প্লেটের সাথে আরেকটি প্লেট যেখানে মেশে সেখানেই বেশি ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা ঘটে। প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে উচ্চ পর্বত থাকলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা আরও বাঢ়ে।

ধারণা করা হয়, প্লেটগুলো একটি আরেকটির সাথে ঘষা বা ধাক্কা খেলে সেখানে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। তাপে ভূ-ত্বকের পদার্থ গলে যায়। এ গলিত পদার্থ চাপের ফলে নিচ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। একেই আগ্নেয়গিরির উদগীরণ বলে। বেরিয়ে আসা গলিত তরল পদার্থ ম্যাগমা নামে পরিচিত।



চিত্র ১২.৭ : ম্যাগমা

একইভাবে প্লেটগুলো একটি অন্যটির সাথে ধাক্কা খেলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। একেই ভূমিকম্প বলে। ইদানীং বাংলাদেশেও ভূমিকম্প ঘটছে।

পাঠ ৯-১০ : শিলামণ্ডল

শিলামণ্ডলের উপরের দিকের অংশ ভূ-ত্বক নামে পরিচিত। ভূ-ত্বক হয় পানি নয়তো মাটি দ্বারা আবৃত। ভূ-ত্বকের বেশীর ভাগ পানি দ্বারা আবৃত। বাকি অংশটি গুড়ে বা ভাঙা পাথুরে পদার্থ দ্বারা আবৃত। এ অংশটি যদি জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত ও নরম হয় তাহলে তাকে মাটি বলা হয়। ভূ-ত্বক মানুষের জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশের উপরে আমরা বাস করি। মাটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করি। এছাড়াও এ অংশে রয়েছে খনিজ পদার্থ যা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।

মাটি গঠন প্রক্রিয়া : সাধারণত পাথর, নুড়ি, কঁকর, বালি, কাদা দ্বারা ভূ-ভূক গঠিত। এদের সাথে মিশে থাকে মৃত উদ্ধিদ ও প্রাণীর দেহের অংশ। ভূ-ভূক গঠনকারী এসকল কঠিন পদার্থের সাধারণ নাম শিলা। কঠিন শিলা থেকে নরম মাটি তৈরি হয় সাধারণত দুটি পর্যায়ে:

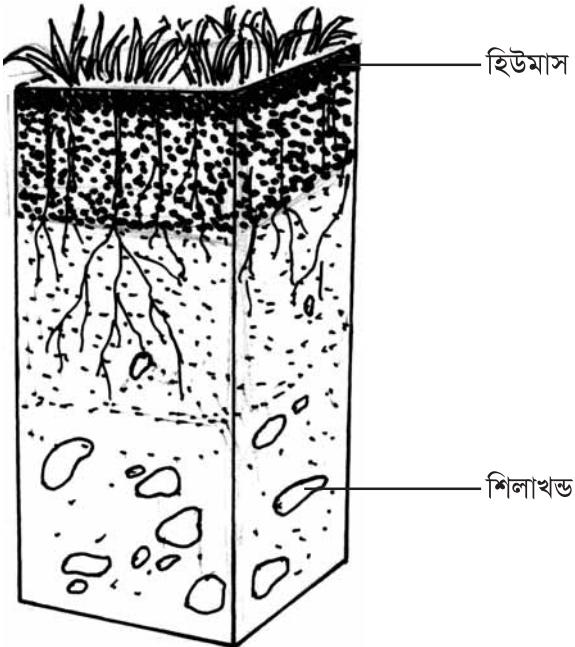
১. **প্রথম পর্যায় :** কঠিন শিলা দীর্ঘদিন ধরে রোদ, বৃষ্টি, বাঢ়ি, ভূমিকম্প এগুলোর কারণে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। এছাড়া বায়ু, বরফ বা পানির প্রবাহ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত ইত্যাদি কারণে অন্য জায়গা থেকে ক্ষুদ্র শিলাকণা এসে একটি স্থানে এসে জমা হয়।
২. **দ্বিতীয় পর্যায় :** ক্ষুদ্র শিলাকণার সাথে পানি, বায়ু, ক্ষুদ্র জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ ঘোগ হয়।

বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানের মাটি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, গঠনেও ভিন্ন। তবে মাটির উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে অনুসন্ধান করলে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তর দেখা যাচ্ছে, তেমনি মাটির একদম উপরের স্তরটিতে পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে থাকে। পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে তৈরি কালো বা অনুজ্জ্বল উপাদানকে হিউমাস বলে। মাটির উপরের দিকে হিউমাস বেশি থাকে। এই হিউমাস থেকে উদ্ধিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। দ্বিতীয় স্তরে হিউমাস কমে আসে, এ জন্য কম কালো বা কিছুটা উজ্জ্বল হয়। তৃতীয় স্তর মূলত ক্ষুদ্র শিলাকণা দ্বারা গঠিত। সবশেষে নিচের স্তরটি কেবল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

বাংলাদেশের নদীর কাছাকাছি স্থানে বন্যা হয়। বন্যার পানি পলিমাটি বয়ে আনে। নদীর কাছাকাছি এসব স্থানের মাটির উপরিভাগ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এসব স্থানের মাটির উপরের স্তর সেজন্য খুব পুরনো হয় না। এ মাটি ফসল চামের জন্য খুব উপযোগী।

খনিজ পদার্থ

আগেই বলা হয়েছে যে, ভূ-ভূক বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর কিছু অংশ জৈব পদার্থ দিয়ে গড়া। আরও আছে অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশের মধ্যে অনেক সময় একাধিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কখনও একটি অজৈব পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় না থেকে আলাদা থাকে। এরপ অজৈব পদার্থকে খনিজ পদার্থ বলে। খনিজ পদার্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এদেরকে মানুষ তৈরি করে না, এদেরকে প্রক্রিতিতেই পাওয়া যায়। চুনাপাথর একটি খনিজ পদার্থ। চুনাপাথর আসলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নামের একটি পদার্থ। বাংলাদেশের জয়পুরহাটে ও সিলেটে



চিত্র ১২.৮: মাটির গঠন

চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর থেকে সিমেন্ট তৈরি হয়। সাধারণত মাটির নিচের দিকে খনিজ সম্পদ বেশি পাওয়া যায়। কখনও এরা ওপরের মাটির সাথেও মিশে থাকে। দরকারী অনেক খনিজ সম্পদ প্রক্রিতিতে পাওয়া যায়। দালান তৈরিতে যে রড ব্যবহার করা হয় তা লোহার তৈরি। গাড়ি, বাস, লক্ষ্ম এগুলো তৈরি হয় লোহা থেকে।

চিউবওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক/তারকাটা, যন্ত্রপাতি এগুলোও তৈরি লোহা থেকে। লোহা মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু হাঁড়ি-পাতিল, চামচ তৈরি হয় এ্যালুমিনিয়াম থেকে। লোহার মতো এলুমিনিয়ামও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। তামা, রূপা, সোনা, দস্তা এসব দরকারী ও দামি পদার্থও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অবশ্য এসব খনিজ সম্পদ বেশি পরিমাণে নেই।

কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির নিচে পাওয়া গেলেও এদেরকে খনিজ পদার্থ বলা হয় না। কারণ এরা জীবদেহ থেকে তৈরি, এরা অজৈব নয়। বড় বড় গাছ মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘ সময়ে এরা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়েছে। জীবদেহ থেকে তৈরি বলে এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। আমাদের দেশে মাটির নিচে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানি হিসেবে বেশ ভালো। এগুলো পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে কলকারখানা চলে, যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রান্না করা হয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার দরকারী দ্রব্যও তৈরি করা হয়। যেমন : প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন তৈরি করা হয়।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

- কোটি কোটি বছর আগে একটি মহাবিস্ফোরণ থেকে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।
- সূর্য এরকম একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে পৃথিবী ও আরও সাতটি গ্রহ। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ হলো চাঁদ।
- সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী খুব গরম ছিল। ধীরে ধীরে এটি ঠাণ্ডা হয়ে জীবের বাসের উপযোগী হয়েছে। পৃথিবীতে পানি ও নানা রকম গ্যাস আছে বলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর তিনটি অংশ- বায়ুমণ্ডল, ভূ-পৃষ্ঠ ও ভেতরের অংশ। বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নানা গ্যাস। ভূ-পৃষ্ঠ ঢাকা আছে পানি, মাটি ও শিলা দ্বারা।
- বরফগলা পানি ও বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নামার ফলে নদীর সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর ভেতরের অংশ বা অভ্যন্তর আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আছে কেন্দ্রমণ্ডল, মাঝখানে গুরুমণ্ডল আর উপরের দিকে শিলামণ্ডল।
- শিলামণ্ডল কতগুলো প্লেটে বিভক্ত। এই প্লেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত হয়।
- কঠিন শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সাথে পানি, বায়ু, ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ মিলে মাটি তৈরি হয়।
- মাটির নিচে রয়েছে অনেক দরকারী পদার্থ। এদের মধ্যে অজৈব পদার্থকে বলে খনিজ পদার্থ। এছাড়া রয়েছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর পাওয়া যায়?

- ক. ঢাকায়
- খ. সিলেটে
- গ. বরিশালে
- ঘ. খুলনায়

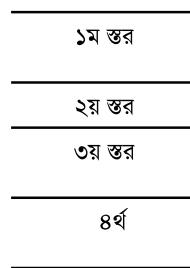
২. কয়লা ও পেট্রোলিয়ামকে জীবাণু জ্বালানি বলা হয়। কারণ এগুলো-

- i. জৈব পদার্থ
- ii. অজৈব পদার্থ
- iii. জীবদেহ হতে তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



মাটির স্তর

৩. চিত্রে প্রদর্শিত কোন স্তরের মাটি কম কালো এবং উজ্জ্বল হয়?

- | | | | |
|----|----------|----|-----------|
| ক. | ১ম স্তর | খ. | ২য় স্তর |
| গ. | ৩য় স্তর | ঘ. | ৪র্থ স্তর |

৪. ১ম স্তরটি গঠিত হয়-

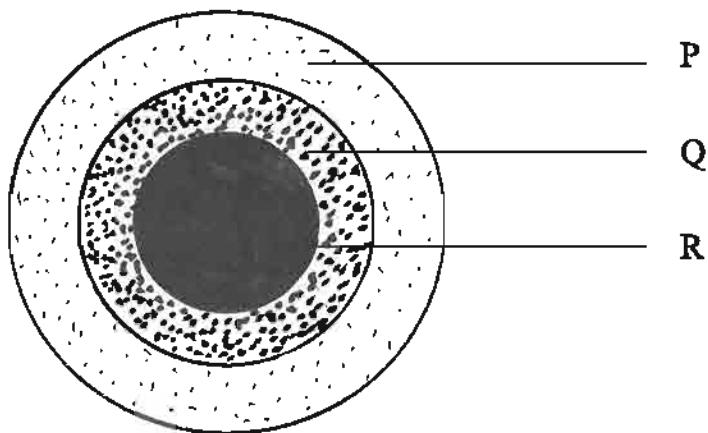
- i. শিলাকণা দিয়ে
- ii. হিটমাস দিয়ে
- iii. পচা ও মৃত জীবদেহ দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

১. শরতের এক সন্ধিয় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় বর্ণ তার মাঝের সাথে ছাদে যায়। ছাদে গিয়ে বর্ণ আকাশে বিভিন্ন ধরনের জ্যোতিক লক্ষ করল। উভয় আকাশে সে একটি জ্যোতিক দেখতে পেল। পূর্ব আকাশেও সে আরেকটি জ্যোতিক দেখতে পেল। কিছুক্ষণ পরে কঁপালী টাঁদের আলো তার চোখে পড়ল।
- বায়ুমণ্ডল কাকে বলে?
 - খনিজ পদার্থ বলতে কী বুঝায়?
 - বর্ণ সবশেষে কোন ধরনের জ্যোতিকের আলো প্রত্যক্ষ করেছিল? ব্যাখ্যা কর।
 - বর্ণার পর্যবেক্ষণকৃত প্রথম দুটি জ্যোতিক একটি অপরাটি হতে ভিন্ন- বিশ্লেষণ কর।



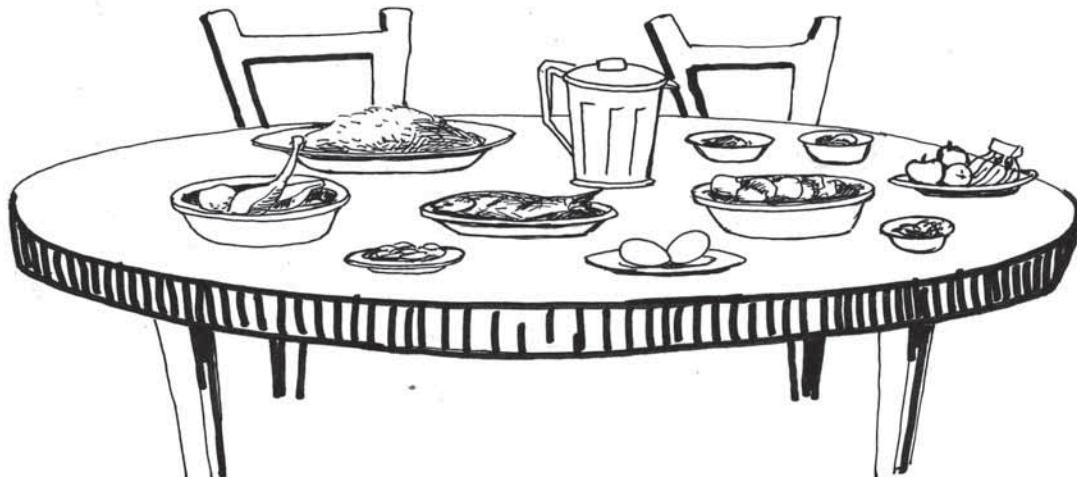
২.

চিত্র : পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ

- ভূ-ভূক কী?
- আগ্নেয়গিরির উদগীরণ বলতে কী বুঝায়?
- R অংশটির গঠন বর্ণনা কর।
- P ও Q-এর যে স্তরটি মাটি গঠন করে তা বিশ্লেষণ কর।

অংশ অধ্যায় খাদ্য ও পুষ্টি

আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু দেখতে পাই। এই বস্তুগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
অজেব ও জৈব বস্তু। শর্করা, প্রোটিন, চর্বি বা স্লেহ ইত্যাদি আমরা জীব থেকে পাই। এগুলো জৈব বস্তু। এ বস্তুগুলো
আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। খাদ্য ও পুষ্টির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পুষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনের একটি প্রক্রিয়া, যা
জটিল খাদ্যকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী হয়। এ অধ্যায়ে খাদ্য, পুষ্টি সম্পর্কে বিশদ
জানতে পারব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

পাঠ-১ : খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য কী? হাঁটা চলা, বাগানে কাজ করা, কুয়া থেকে পানি তোলা, কাঠ কাটা, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা বা ফুটবল খেলা
ইত্যাদি কাজ করার পর আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের ক্ষুধা পায়। আমরা তখন কী করি? আমরা খাবার খাই।
খাবার খাওয়ার পর আমরা কী রকম বোধ করি? শক্তি ফিরে পাই। খাদ্য আমাদের শক্তি দেয় ও কাজ করার ক্ষমতা
যোগায়।

মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কাজের ক্ষমতা অর্জন, শারীরিক সুস্থিতার জন্য খাদ্য প্রয়োজন।
দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে, দেহকে সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন,
সেসব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুই খাদ্য।

খাদ্য আমাদের শক্তি যোগায়, ক্ষয়পূরণ করে, বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাবার খাই।

পুষ্টি কী?

আমরা প্রতিদিন আমাদের চাহিদামতো চাল, ডাল, আটা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারি ও কাঁচা ফলমূল খেয়ে থাকি। এ খাবারগুলো সরাসরি আমাদের দেহ গ্রহণ করতে পারে না। এই জটিল উপাদান সমৃদ্ধ খাবারগুলো আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রে পরিপাক বা হজম হয়ে দেহে গ্রহণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয়। জীবকোষ এই সরল উপাদানগুলো শোষণ করে নেয়। এই পরিশোষিত খাদ্য উপাদান দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পুষ্টি।

খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে ও কাজ করার শক্তি যোগায়। আমাদের দেহে খাদ্যের নানা রকম কাজ রয়েছে। যেমন : তাপ উৎপাদন, দেহের ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও রোগ প্রতিরোধ অর্জন।

নতুন শব্দ : পুষ্টি, খাদ্য উপাদান।

পাঠ-২ : খাদ্যের প্রকারভেদ

মৌটুসী আমড়া, পেয়ারা, কামরাঙ্গা খেতে পছন্দ করে, বিবিন্নের পছন্দ মাছ, মাংস, মিষ্ঠি, আর তুলির পছন্দ পাউরগঢ়ি, বিস্কুট, চিপ্স ইত্যাদি। এ খাবারগুলো ভিন্ন স্বাদ ও গুণাগুণের দিক থেকে আলাদা। স্বাদ ও গুণাগুণ বিচারে খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : প্রোটিন বা আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য। এ তিন প্রকার খাদ্য আমাদের দেহগঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি যোগায়। এছাড়া খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি হলো আরো তিন প্রকার খাদ্য উপাদান। এ উপাদানগুলো দেহকে রোগমুক্ত ও সবল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা

যেসব খাবারে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন : চাল, আটা, ময়দা, ভুট্টা, চিনি, গুড় ইত্যাদি। কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আমরা শর্করা পেয়ে থাকি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ জাতীয় খাদ্যই বেশি খাই। কোনো খাদ্যে শর্করা আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করে। শর্করা আয়োডিন দ্রবণের রঙের পরিবর্তন করে।



চিত্র : ১৩.১ শর্করা জাতীয় খাদ্য

কাজ :

১. শর্করা সহজে হজম হয়, দেহের কাজ করার শক্তি যোগায়।
- ও তাপ উৎপন্ন করে।
২. শর্করায় বিদ্যমান সেলুলোজ কোষ্ঠকার্টিন্য দূর করে।

কাজ : শর্করা চেনার উপায় পরীক্ষণের জন্য একটি টেস্টটিউবে অথবা কাচপাত্রে সামান্য পরিমাণে আটা গুলে নাও। মিশ্রণটি টেস্টটিউবে নিয়ে জুলন্ত স্প্রিট ল্যাম্পের উপর ধর। মিশ্রণটি গরম হলে, এ মিশ্রণে দুই ফেঁটা পাতলা আয়োডিন দ্রবণ ভালো করে মিশিয়ে নাও। দেখ কী ঘটে? মিশ্রণটিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? মিশ্রণটি গাঢ় বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে। অতএব আটা শর্করা জাতীয় খাদ্য। দ্রবণে শর্করা থাকার কারণে আয়োডিনের রঙের পরিবর্তন ঘটেছে। খাদ্যে শর্করা থাকার কারণে এই পরিবর্তন ঘটেছে।

নতুন শব্দ : সেলুলোজ, কোষ্ঠকার্টিন্য, প্রোটিন।

পাঠ-৩ : প্রোটিন

সেন বাবুর বড় ছেলে গৌতমের পছন্দ মাছ ও ডিম, আর ছোট ছেলের সুকুমারের পছন্দ মাংস ও দুধজাত খাদ্য। এগুলো কী জাতীয় খাদ্য? উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ প্রোটিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধজাত দ্রব্য প্রোটিনের উৎস প্রাণী তাই এগুলো প্রাণিজ প্রোটিন। অপরদিকে ডাল, বাদাম, শিম ও বরবটির বীজ ইত্যাদির উৎস উদ্ভিদ, এগুলো উদ্ভিজ প্রোটিন।

প্রোটিনের কাজ

১. প্রোটিনের প্রধান কাজ হচ্ছে দেহে বৃদ্ধির জন্য কোষ গঠন করা।
যেমন- দেহের পেশি, হাড় বা অঙ্গ ও রক্ত কণিকা ইত্যাদি প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
২. দেহে শক্তি উৎপন্ন করা।
৩. দেহে রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি প্রোটিন থেকে তৈরি হয়।



চিত্র ১৩.২ : প্রোটিন

শিশুদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটলে কোয়াশিয়ারকর রোগ হয়। এ রোগের কারণে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুদেহের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হলে শিশু পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টিতে ভোগে।

কাজ : একটি টেস্টটিউবে সামান্য পানি নাও। এর ভিতরে ডিমের সাদা তরল অংশ চেলে দাও। এবার মিশ্রণটি স্প্রিট ল্যাম্পের আগুনে গরম কর। তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

তরল প্রোটিন উত্তোলনে শক্ত হয়ে যায়।

যে প্রোটিন শক্ত অবস্থায় থাকে। তা নির্ণয় করার জন্য ল্যাবরেটরির দামি রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়।

নতুন শব্দ : রক্তকণিকা, উদ্ভিজ প্রোটিন, প্রাণিজ প্রোটিন।

পাঠ ৪-৫ : স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ও ক্যালরি

যেসব খাদ্যে তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য বেশি থাকে, এদেরকে স্নেহ জাতীয় খাদ্য বলে। প্রোটিনের মতো স্নেহ জাতীয় খাদ্য দুই প্রকার। মাছের তেল, মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন ইত্যাদি প্রাণী থেকে পাই, এরা প্রাণিজ স্নেহ। সয়াবিন, বাদাম, সরিষা, তিল ও জলপাই ইত্যাদির তেল উদ্ভিজ স্নেহ। মাংসের চর্বি, ঘি ও মাখন ইত্যাদি জমাট স্নেহ। সয়াবিন, সরিষা, তিল, জলপাই ও বাদাম ইত্যাদির তেল তরল স্নেহ।

কাজ :

১. দেহের তাপ ও কর্মশক্তি বাড়ায়, তখের নিচের চর্বিস্তরে দেহের তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে।
২. দেহের প্রোটিনকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।
৩. দেহে ভিটামিন এ,ডি,ই এবং কে-এর যোগান দেয়।



চিত্র ১৩.৩ : স্নেহ জাতীয় খাদ্য

কাজ : স্নেহ পদার্থ চেনার পরীক্ষণের জন্য একটুকরো সাদা কাগজের উপর কয়েক ফেঁটা সয়াবিন তেল ফেলে কাগজের উপর ঘষে নাও। এবার আলোর দিকে কাগজটি ধর। কাগজের যে জায়গায় তেলের ফেঁটা ফেলা হয়েছে সে জায়গাটি স্বচ্ছ মনে হচ্ছে কী?

কাগজের উপরের স্বচ্ছ জায়গাটির ভেতর দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করছে। এটা তেল বা চর্বি চেনার একটি সহজ পদ্ধতি।

ক্যালরি কী?

শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় খাদ্য উপাদান থেকে দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ আমাদের দেহের ভিতরে খাদ্যের পরিপাক, বিপাক, শ্বাসকার্য, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে। শারীরিক পরিশ্রমে শক্তি ব্যয় হয়। খাদ্য শক্তি সংপৃষ্ঠির থাকে। আমরা খাবার থেকেই শক্তি পাই।

খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক হলো কিলোক্যালরি।

যেসব খাদ্যে শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ থাকে, সেসব খাদ্য থেকে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়। সেসব খাদ্যে পানি ও সেলুলোজের পরিমাণ বেশি থাকে, সেসব খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ক্যালরির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে।

নিচের সারণিটি দেখ। এতে কয়েকটি উচ্চ ও নিম্ন ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্যের তালিকা দেখানো হলো :

উচ্চ ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্য	নিম্ন ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্য
ভোজ্যতেল	চাল কুমড়া
ঘি	বাধাকপি
মাখন	বিঙা
মাছের তেল	শালগাম
ঘন নারকেলের দুধ	টমেটো
মাখন তোলা গুঁড়া দুধ	ডঁটা
ভাজা চিনা বাদাম	লাউ
চিনি	পালংশাক
মধু	কলমি ডঁটা
খেজুরের গুড়	মূলা
চেলার ডাল	ওলকপি
সয়াবিন	ধুন্দল
শিমের বীচি	পটল

প্রতিদিন কার কত ক্যালরি বা তাপশক্তি প্রয়োজন তা নির্ভর করে প্রধানত বয়স, ওজন, দৈহিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।

কাজ : তোমার এলাকায় পাওয়া যাই এমন সব কম ক্যালরিয়ুক্ত ও বেশি ক্যালরিয়ুক্ত খাবারের নমুনা ও তালিকার একটি চার্ট তৈরি কর।

নমুন শব্দ : ক্যালরি, প্রাণিজ স্নেহ, উত্তিজ্জ স্নেহ।

পাঠ-৬ : ভিটামিন

খাদ্যে অতি সামান্য মাত্রায় এক একার জৈব পদার্থ আছে, যা ধোগীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যগুণ বা ভিটামিন বলে। আমরা প্রতিদিন যেসব খাদ্য (যেমন-চাল, আটা, বাদাম, ডাল, শাকসবজি, ফলমূল) খাই এর মধ্যেই ভিটামিন থাকে। ভিটামিন আলাদা কোনো খাদ্য নয়।

অনেক দিন ধরে দেহে কোন ভিটামিনের অভাব ঘটলে নানা রুক্ষ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাই।



চিত্র : ১৩.৪ কয়েকটি ভিটামিনসমৃদ্ধ শাকসবজি ও ফল।

খুব সামান্য পরিমাণে হলোও আমাদের দেহে ভিটামিনের ভূমিকা অপরিহার্য।

আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলোর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো। ছকে যে সমস্ত খাদ্যে ভিটামিন আছে তাদের নাম, উৎস, ভিটামিন গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও বিবরণ দেওয়া হলো।

ভিটামিন	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
এ দেহে জমা থাকে	কলিজা, ডিম, মাখন, পনির, মাছ, টাটকা সবুজ শাকসবজি, গাজর, আম, কাঠাল, পাকা পেঁপে	দেহের বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধে।
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (বেশ কয়েকটি ভিটামিন একত্রে গঠিত। দেহে জমা থাকে না।)	ডিম, কলিজা, বৃক্ষ, মাংস, দুধ, গম, লাল চাল, পনির, শিম এবং বাদাম।	দেহের বৃদ্ধি, হৃদপিণ্ড, স্নায় এবং পরিপাক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে, চামড়ার স্বাস্থ্য রক্ষায়।
সি রঞ্জনে অথবা মজুদ রাখলে নষ্ট হয়ে যায়।	লেবু, কমলা, আমলকী, পেয়ারা, জামুরা, টমেটো, কচুশাক, কলমিশাক, সবুজ শাক-সবজি,	সুস্থ-স্বল হাড়, দাঁত, দাঁতের মাড়ি ও মুখের ক্ষত সারাতে।
ভিটামিন ডি (দেহে জমা থাকে)	দুধ, মাখন, ডিম, মাছের তেল (সূর্যের আলোতে আমাদের শরীরের চামড়া এই ভিটামিন তৈরি করতে পারে)	দেহকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যবহারে সাহায্য করে বা সুস্থ-স্বল হাড় ও দাঁত গঠনে প্রয়োজন।

নতুন শব্দ : ভিটামিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স

পাঠ-৭ : খনিজ লবণ ও পানি

রহিমন গলগণ, সাহিদা রক্তাল্পতায় ভুগছে— এরা কেন এসব রোগে ভুগছে? খনিজ লবণের অভাবে তাদের দেহে এসব
রোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভাত ও তরকারির সাথে আমরা যে লবণ খাই। তাছাড়াও আমাদের দেহের জন্য আরও কয়েক
প্রকার লবণ প্রয়োজন হয়। দেহ কোষ ও দেহ তরলের জন্য (যেমন- রক্ত, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি) খনিজ লবণ
খুবই দরকারি। খনিজ লবণ দেহ গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- পেশি সংকোচন, স্নায় উত্তেজনা) নিয়ন্ত্রণে
সহায়তা করে। হাড় এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান।

উল্লিঙ্ক মাটি থেকে সরাসরি খনিজ লবণ শোষণ করে। আমরা প্রতিদিন যে শাকসবজি, ফলমূল খাই এ থেকে আমরা
প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পেয়ে থাকি। আমাদের দেহের ওজনের ১% পরিমাণ লবণ থাকে। এ উপাদানগুলো হলো
ফসফরাস, পটসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, সেডিয়াম, ক্লোরিন ও ম্যাগনেসিয়াম। এছাড়া লৌহা, আয়োডিন, দস্তা,
তামা ইত্যাদি খনিজ লবণ আমাদের দেহের জন্য অতি সামান্য পরিমাণে দরকার। এগুলোর অভাব ঘটলে দেহে
মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন আয়োডিনের অভাবে গলগণ রোগ হয়। খাবার লবণের সাথে আয়োডিন মিশিয়ে
আয়োডাইড লবণ তৈরি করা হয়। গলগণ রোধে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া উচিত।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণগুলো নিচের ছকে দেওয়া আছে। কোন কোন খাদ্যে এগুলো পাওয়া যায় এবং এদের প্রয়োজনীয়তার বিবরণও এই ছকে আছে।

খনিজ লবণ	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
ক্যালসিয়াম	দুধ, মাংস, সবুজ শাকসবজি।	দাঁত ও হাড়ের সুস্থিতায়, রক্ত জমাট বাঁধতে, স্নায়ু ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে।
ফসফরাস লবণ	দুধ, মাংস, ডিম, ডাল, সবুজ শাকসবজি।	সুস্থ দাঁত ও হাড়ের জন্য।
লোহ	মাংস, ফল, সবুজ শাকসবজি	রক্তের লাল কণিকা বৃদ্ধি করে রক্তস্তন্তা দূর করে।
আয়োডিন	সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক মাছ, মাছের তেল।	থাইরয়েড গ্রাহনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে গলগণ রোগ মুক্ত রাখে।
সোডিয়াম	সাধারণ লবণ, নোনা ইলিশ, পনির, নোনতা বিস্কুট।	দেহের অধিকাংশ কোষে এবং দেহ রসের জন্য এর স্বল্পতা দেহে আড়ষ্ট ভাব আনে।
ম্যাগনেসিয়াম	সবুজ শাকসবজি।	এনজাইম বিক্রিয়া দাঁতের শক্ত আবরণ গঠনে ভূমিকা রাখে।
ক্লোরিন	খাবার লবণ	দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা, হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করা।
পটাসিয়াম	মাছ, দুধ, ডাল, আখের গুড়, শাকসবজি।	পেশি সংকোচনে ভূমিকা রাখে।

পানি :

পানি খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। জীবন রক্ষার কাজে অঙ্গিজেনের পরই পানির স্থান। খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক দিনও বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহের দুই-তৃতীয়াংশ হলো পানি।

পানি দেহের গঠন, অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- খাদ্য গলধংকরণ, পরিপাক ও শোষণ ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পানির কারণে রক্ত তরল থাকে। যা রক্ত সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পানি দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে। পানির আরও একটি প্রধান কাজ হলো মলমূত্রের সাথে ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ করা। পানির অভাবে কোষ্ঠকার্টিন্য দেখা দেয়, বিপাক ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। তাই আমাদের নিয়মিত পরিমাণ মতো নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন।

রাফেজ : শস্যদানা, ফল ও সবজির কিছু অংশ যা হজম বা পরিপাক হয় না এমন তন্ত্রময় বা আঁশযুক্ত অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। ফল ও সবজির রাফেজ সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই নয়। রাফেজ হজম হয় না। রাফেজ পরিপাকের পর অপরিবর্তিত থাকে। এই অপরিবর্তিত রাফেজ মানবদেহে মল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নতুন শব্দ : রাফেজ, এনজাইম

পাঠ-৮ : সুষম ও অসুষম খাদ্য

জয়া ও জিতু দুই বন্ধু। ওরা দুজনই ষষ্ঠি শ্রেণিতে পড়ে। জয়া শুকনা, পাতলা গড়নের, দুর্বল, পড়ালেখায় অমনযোগী। সবসময় ওকে মনমরা দেখায়। প্রায়ই অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। জিতু একদিন জয়াদের বাড়িতে বেড়াতে গেল। সে জয়ার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারল জয়া নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে না। সে ঘেটুকু খাবার খায় তাতে ভাত, মাছ, মাংসের পরিমাণ থাকে সামান্য। ডিম, দুধ ফল-মূল শাকসবজি একেবারেই খায় না। মা জোর করেও ওগুলো তাকে খাওয়াতে পারেন না। মা ওকে নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাহলে বল তো জয়ার খাবার তালিকাটি কী সঠিক? সে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় সামান্য পরিমাণ। অন্যান্য খাবার না খাওয়ায় ওর দেহে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ ওর খাবার তালিকাটি সুষম নয়। কারণ যে খাবার তালিকায় সব কয়টি খাদ্য উপাদান থাকে না, সেটি সুষম খাদ্যের তালিকা নয়।

সুষম খাদ্য বলতে আমরা কী বুঝি? সুষম খাদ্য বলতে আমরা সেই সকল খাবার বুঝি, যাতে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পরিমাণ মতো থাকে। অর্থাৎ প্রোটিন, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও পানি দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে থাকে। সুষম খাদ্য খেতে হলে আমাদের খাদ্য তালিকায় শর্করা, প্রোটিন, তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ লবণের উপাদান থাকা আবশ্যিক।

জয়া যে খাবার খাচ্ছে তা সুষম না হওয়ায় দেহের বৃদ্ধি ঘটছে না, কাজে শক্তি পায় না। দুর্বল বোধ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ কম। স্বাভাবিক বৃদ্ধি, কর্মশক্তি উৎপাদন ও শরীরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

অসুষম খাদ্য : যে খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানের যেকোনো একটি কম থাকলে বা না থাকলে তাকে অসুষম খাদ্য বা অসম খাদ্য বলে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকের খাদ্যই অসম। সাধারণ মানুষের খাদ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই শর্করা। খাদ্যে প্রোটিন, শর্করা, খনিজ লবণ, ভিটামিন পরিমাণের চেয়ে কম থাকলে দেহে পুষ্টির অভাব ঘটে। অর্থাৎ দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলে থাকি।

স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন। যথা-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে।
- যথেষ্ট পরিমাণ শাকসবজি খেতে হবে।
- মাছ বেশি খেতে হবে।
- মিষ্টি ও তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে।
- লবণ কম খেতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে স্থানীয় সহজলভ্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত খাদ্য উপাদানগুলো শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

এ অধ্যায় থেকে আমরা যা জানলাম :

- খাদ্য তিন প্রকার।
- খাদ্য উপাদান ছয় প্রকার।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এ উপাদানগুলো শাকসবজি ও ফলমূলের ভিতর থাকে।
- অতিরিক্ত প্রোটিন বা শ্বেতসার খাওয়া উচিত নয়।
- সুষম খাদ্য আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন।
- খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক কিলোক্যালরি। প্রতিদিন কার কত তাপশক্তি বা ক্যালরি প্রয়োজন তা নির্ভর করে বয়স, ওজন, দৈহিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমরা শাক সবজি ও ফলমূল থেকে ----- ও ----- পাই।
২. ভিটামিন এ-এর অভাবে ----- রোগ হয়।
৩. তাপশক্তি মাপার একক -----।
৪. ----- প্রোটিন থেকে তৈরি।
৫. ----- দেহের প্রোটিনকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।

লাইন টেনে ডান দিকের খাদ্য বস্তুগুলো যেটি যে শ্রেণির বাম দিকের সেই শ্রেণির সাথে যুক্ত কর।

প্রোটিন	মাংস
শর্করা	বাদাম
চর্বি	মাছ
	আলু
	দুধ
	ডিম
	মাখন
	ঘি
	সয়াবিন

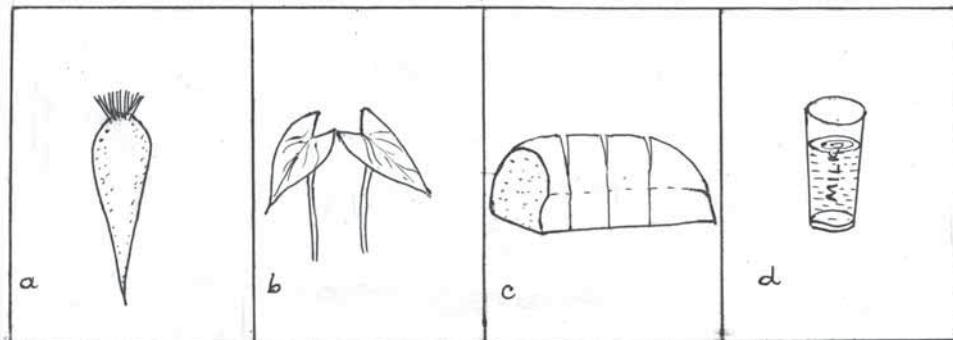
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নিচের কোনটি পানিতে দ্রবণীয়?

ক. ভিটামিন এ	খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন ডি	ঘ. ভিটামিন ই
২. নিচের কোনটি প্রাণিজ আমিষ?

ক. ডাল	খ. দুধ
গ. বাদাম	ঘ. ঘি

ছকে প্রদত্ত চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. উপরের কোন খাদ্যে স্নেহ উপাদান তুলনামূলকভাবে বেশি?

- | | |
|------|------|
| ক. a | খ. b |
| গ. c | ঘ. d |

৪. পরিপাক নালি পরিষ্কারে ভূমিকা রাখে-

- | | |
|--------|-------|
| i. a | ii. b |
| iii. c | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. খাদ্য তালিকায় লোহের উপকারিতা কী?
২. আমরা খাবার খাই কেন?
৩. মানুষ শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে না কেন?
৪. আয়োডিনের অভাবে কী রোগ হয় তা বর্ণনা কর।
৫. আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে যদি প্রয়োজনীয় ভিটামিন না থাকে তাহলে কী হবে?

নিজেরা কর :

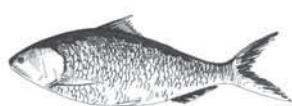
১. একগ্লাস পানিতে দুই চা চামচ সরিষার তেল মিশাও। কী ঘটে ব্যাখ্যা কর।
২. ভিজানো আটার রুটি বা ভাতে যে শ্বেতসার উপাদান আছে তা তুমি কীভাবে পরীক্ষা করবে?

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. নিম্নের চিত্রগুলো দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও।



A.



B.



C.



D.

- ক) খাদ্য কাকে বলে ?
 খ) A চিহ্নিত খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
 গ) D চিহ্নিত খাদ্যটি কীভাবে দেহের ওজন বাড়ায় ?
 ঘ) সুষম খাদ্য হিসাবে চিত্রের খাদ্যগুলো উপযোগী কি না তা বিশ্লেষণ কর।
২. মরিয়ম ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। সে একেবারেই শাকসবজি খেতে চায় না। কিছুদিন ধরে সর্দি-কাশি ও জ্বরে ভুগছে। কয়েক দিন যাবত সে রাতে ভালো দেখতে পায় না। তার বাবা-মা চিকিৎসা হয়ে পড়লেন। মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ডাক্তার তার মাকে মেয়ের চোখে কম দেখার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এবং রঙিন শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।
- ক) পুষ্টিহীনতা কাকে বলে?
 খ) মরিয়মের কী রোগ হয়েছে?
 গ) ডাক্তার তাকে শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন কেন?
 ঘ) মরিয়মের কী করা উচিত? তোমার এ ব্যাপারে যুক্তি কী -ব্যাখ্যা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন

তোমরা জান, আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই এই পরিবেশ। একটি স্থানের সকল জড় ও জীব নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ তুমি দেখতে পাবে। পরিবেশের এই বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জীবও বিভিন্ন ধরনের হয়। তোমরা জান জীবের মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। একটি পরিবেশে কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করবে তা নির্ভর করে সেখানকার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপরে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবকে প্রভাবিত করে।

এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে তোমরা

- প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবেশের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবেশের উপাদানসমূহের সংরক্ষণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

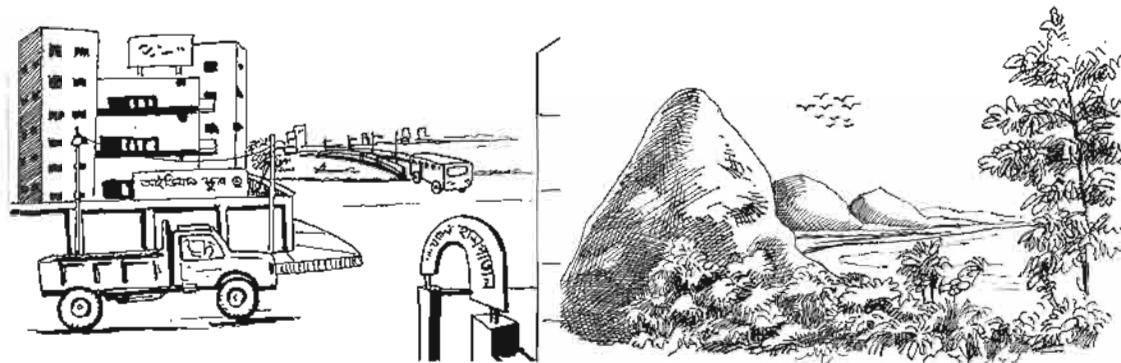
পাঠ - ১ : প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমাদের চারপাশের পরিবেশ লক্ষ কর। দেখবে পরিবেশের কিছু জিনিস মানুষ তৈরি করেছে। আবার কিছু আছে যা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি। অর্থাৎ যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না। তাহলে কোনটিকে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলবো?

কাজ : তোমার বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে বিদ্যালয়ে পৌছা পর্যন্ত আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের তৈরি এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি বস্তুগুলো শনাক্ত করে এগুলোর নাম তোমার মেট খাতায় লিখে রাখ। শ্রেণিতে আলোচনা কর। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি বস্তুগুলো নিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাই প্রাকৃতিক পরিবেশ। এর মধ্যে জড় বস্তু ও জীব দুটোই রয়েছে যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না।

মানুষ তার প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি, বাস-ট্রাক, নৌকা, রাস্তাঘাট, সেতু, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে। এগুলো মানুষের তৈরি পরিবেশ নামে পরিচিত।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, আমাদের চারপাশের পরিবেশে আরও কিছু বস্তু আছে যা মানুষ তৈরি করতে পারে না। যেমন- চাঁদ, তারা, মাটি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বনজঙ্গল, মানুষ পশু-পাখি ইত্যাদি। এগুলো সবই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান।

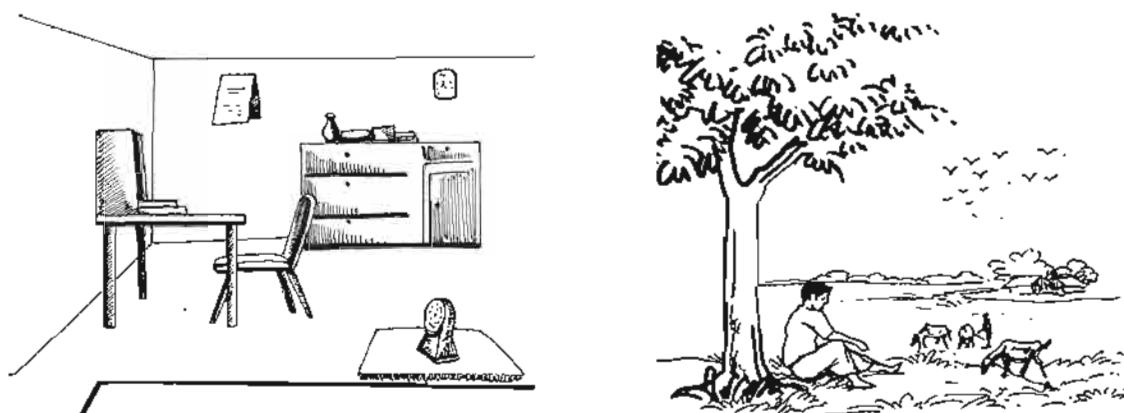


চিত্র ১৪.১ : মানুষের তৈরি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। বেমন : বনজঙ্গলের পরিবেশ, পাহাড়-পর্বতের পরিবেশ, পুকুরের পরিবেশ ইত্যাদি। তোমার দেখা বা জানা এ ধরনের আর কী কী প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে?

পাঠ - ২ : পরিবেশের উপাদান

পরিবেশকে অধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো পরিবেশের সকল সঙ্গীব উপাদান, যা জীব উপাদান নামে পরিচিত। এই জীব উপাদানকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল উপাদান নিয়ে আর একটি পরিবেশ গঠিত। যাকে বলা হয় জড় পরিবেশ বা অজীব পরিবেশ।



চিত্র ১৪.২ : জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশ

কাজ : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। ক্লেইন মাঠে যাও। পরিবেশ পর্ববেক্ষণ কর। জড় পরিবেশ এবং জীব পরিবেশের উপাদানগুলো শনাক্ত করে নোট খাতায় লিখ। দলে আলোচনা কর। পোস্টার পেপারে ছক তৈরি কর। জড় ও জীব উপাদানগুলোর নাম ছকে লিখ। প্রেসীডেন্টে উপস্থাপন কর।



সমন্বয় বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যযী হওয়া ভালো



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ: